টিআইবি-সিএইচআরআই ২০১১

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন

প্রায়োগিক নির্দেশিকা

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টিআইবি'র কর্মসূচি

১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালিত করে আসছে। বাংলাদেশে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক প্রাতিষ্ঠানিক আইন ও নীতি প্রণয়ন, সংস্কার সাধন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত করার চাহিদা জোরালো করা এবং সুনির্দিষ্ট ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে টিআইবি জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন অধিকতর প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা ও প্রচারাভিযান

টিআইবি একটি দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে 'সচেতন নাগরিক কমিটি' গঠনের মাধ্যমে একটি প্ল্যাটফরম প্রতিষ্ঠা করেছে। স্থানীয় সচেতন, শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত, দলীয় রাজনীতিমুক্ত, উদ্যোগী ও সাহসী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সচেতন নাগরিক কমিটি (Committee of Concerned Citizens) বা সনাক। টিআইবি'র সিভিক এনগেইজমেন্ট বিভাগের ওপর অর্পিত স্থানীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রচারণা কার্যক্রমের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সনাক এবং সনাক সংশ্লিষ্ট ইয়েস (ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট) গ্রুপ। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইতিপূর্বে অর্জিত পরিবর্তন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য সনাক তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনাসহ বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে 'সততার অঙ্গীকার/চুক্তি' সম্পাদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সেবাগ্রহীতাদের নিকট আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা ও পলিসি

ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত ফলাফল বা পরিবর্তনসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংস্কারের লক্ষ্যে টিআইবি জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা ও পলিসি নিয়ে কাজ করছে। জাতীয় পর্যায়ে তথ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি করার জন্য ডায়াগনস্টিক স্টাডি, জাতীয় সততা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ, করাপশন ডেটাবেজ, জাতীয় খানা জরিপ এবং রিপোর্ট কার্ড জরিপ গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে যোগাযোগ ও প্রচার

বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে প্রণীত সুশাসন সম্পর্কিত সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পলিসি অ্যাডভোকেসিসহ দেশের সাধারণ জনগণ ও যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির জন্য টিআইবি কাজ করছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের সকল প্রকার যোগাযোগ, প্রচারাভিযান, অ্যাডভোকেসি, বিভিন্ন ইস্যুতে ইয়েস এর দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম, ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ইয়েস গ্রুপ গঠন এবং এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনসহ সকল প্রকার প্রকাশনা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার, সদস্যপদ কার্যক্রম, ই-বুলেটিন, গণমাধ্যম প্রচারণা, এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাপনা, স্ট্র্যাটেজিক ও কর্ম-পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডকুমেন্ট ও ম্যানুয়েল, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েব সাইটে সহজপ্রাপ্য। যে সকল তথ্য ওয়েব সাইট বা অন্য প্রকাশনার মাধ্যমে পাওয়া যাবে না তা ই-মেইল বা ফোনের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। জনগণের তথ্য অধিকারের স্টেকহোল্ডার হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের মাধ্যমগুলো হলো: info@ti-bangladesh.org অথবা ফোন বা চিঠির মাধ্যমে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা যাবে। তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছেন: কুমার বিশ্বজিত দাশ, ম্যানেজার, রিসোর্স সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩ ০৬৫ ০১৬।

সিএইচআরআই এর কর্মসূচি

সিএইচআরআই এ বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে যে, সাধারণ মানুষের জীবনে মানবাধিকার, প্রকৃত গণতন্ত্র এবং উন্নয়নকে বাস্তবিক করে তোলার জন্য কমনওয়েলথ এবং এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণের জন্য উচ্চ মানসম্পন্ন এবং কার্যকর কৌশল থাকা উচিত। সেইসাথে, সিএইচআরআই মানবাধিকার, তথ্য প্রাপ্তি এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তি প্রতিষ্ঠায় অ্যাডভোকেসি কর্মসূচি এবং কৌশলগত উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের গবেষণা, প্রকাশনা, কর্মশালা, তথ্য প্রচার এবং অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সিএইচআরআই তার কর্মসূচি পরিচালনা করে।

কৌশলগত উদ্যোগ

সিএইচআরআই কমনওয়েলথভুক্ত সদস্য দেশসমূহের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো তদারকি করে এবং যেসব দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে এর প্রয়োজনীয়তার ওপর অ্যাডভোকেসি করে থাকে। সিএইচআরআই কৌশলগতভাবে কমনওয়েলথ মিনিস্ট্রিয়াল অ্যাকশান গ্রুপ, জাতিসংঘ এবং আফ্রিকান কমিশন ফর হিউম্যান অ্যান্ড পিপলস' রাইটস্‌সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জড়িত। সিএইচআরআই বর্তমানে যেসব কৌশলগত উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে: কমনওয়েলথের সংস্কার কাজ পরিবীক্ষণ এবং সংস্কারের জন্য অ্যাডভোকেসি করা; কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পর্যালোচনা করা এবং কাউন্সিলের ইউনিভার্সাল পিরিয়োডিক রিভিউ এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া; সুশীল সমাজের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার রক্ষাকারীদের নিরাপত্তার জন্য অ্যাডভোকেসি করা; এবং কমনওয়েলথের জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা।

তথ্য প্রাপ্তি

সিএইচআরআই সরকার ও সুশীল সমাজকে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। এটি আইনী বিষয়ে কারিগরী দক্ষ হিসেবে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে এবং সহযোগী সংগঠনগুলোকে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা করে। সিএইচআরআই স্থানীয় গ্রুপ ও কর্মকর্তাদের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করে, সরকার ও সুশীল সমাজের সক্ষমতা তৈরি করাসহ নীতি-প্রণেতাদের সাথে এই ইস্যুর পক্ষে সমর্থন আদায়েও কাজ করে। এটি দক্ষিণ এশিয়ায় বেশি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। বিশেষ করে, সাম্প্রতিক সময়ে এটি ভারতের একটি জাতীয় আইনের জন্য একটি সফল ক্যাম্পেইনে সহায়তা দান, আফ্রিকায় আইনের খসড়া প্রণয়নে সাহায্য ও মতামত প্রদান, এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আইন প্রাপ্তির জন্য আগ্রহ সৃষ্টিতে আঞ্চলিক ও জাতীয় সংগঠনগুলোর সাথে কাজ করছে।

ন্যায়বিচার প্রাপ্তি

পুলিশ সংশোধন: বিশ্বের অনেক দেশেই পুলিশ বাহিনীকে নাগরিকদের অধিকার রক্ষাকারী না হয়ে বরং রাষ্ট্রের একটি নিপীড়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা যায় যারা অধিকারের সর্বোচ্চ লঙ্ঘন এবং ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করে থাকে। এক্ষেত্রে সিএইচআরআই ব্যবস্থাগত সংশোধনকে উৎসাহিত করে যাতে করে পুলিশ বাহিনী বর্তমান সরকারে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত না হয়ে বরং আইনের শাসন প্রয়োগকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ভারতে সিএইচআরআই-এর কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে, পুলিশ সংশোধনের জন্য জনসমর্থন সৃষ্টি করা। পূর্ব আফ্রিকা ও ঘানায়, সিএইচআরআই পুলিশের জবাবদিহিতা এবং তাদের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কারাগার সংশোধন: সনাতনী বদ্ধ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা এবং অনিয়ম তুলে ধরা হচ্ছে সিএইচআরআই-এর কাজের লক্ষ্য। আইনী ব্যবস্থার ব্যর্থতা তুলে ধরা হচ্ছে-এর একটি প্রধান কাজের ক্ষেত্র। আইনী ব্যবস্থার ব্যর্থতা কারাগারগুলোকে চরম জনঅধ্যুষিত করে ফেলছে এবং বিচার-পূর্ব সাজাকে দীর্ঘায়িত করছে। সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ কারাগার তদারকি ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার হচ্ছে সিএইচআরআই-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্র। সিএইচআরআই বিশ্বাস করে, এ ক্ষেত্রগুলোতে মনোযোগ দিলে তা কারা প্রশাসনে উন্নয়ন সাধন করবে এবং সার্বিক বিচার প্রশাসনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন
প্রায়োগিক নির্দেশিকা

মূল সংস্করণ

প্রধান রচয়িতা
চারমেইন রডরিগজ্

সহায়তা
মাজা দারুওয়ালা, দিপীকা মোগিলিশেঠী, অদিতি দত্ত এবং ইন্দ্রজিৎ মিস্ত্রী

পুনঃসম্পাদনা
রেশমী মিত্র, জেমস্ ফারগুসান, ভেঙ্কটেশ নায়েক

মূল অনুবাদ
খালেদা আক্তার

অনুবাদ সহকারী
সানিয়া সিদ্দীকা

বাংলা সংস্করণের সম্পাদক
রঞ্জনেশ্বর হালদার, রিজওয়ান-উল-আলম, সাজ্জাদ হুসেইন, শাহজাদা এম আকরাম, সোহিনী পাল

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ও

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই)

এর একটি যৌথ প্রকাশনা

২০১১

মুখবন্ধ

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৯ এর ২৯ মার্চ বাংলাদেশে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে একই বছরের ১ জুলাই থেকে এ আইনটি কার্যকর করা হয়। ২০০৯ এর ১ জুলাই প্রধান তথ্য কমিশনার এবং একজন নারীসহ দুইজন তথ্য কমিশনারের সমন্বয়ে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আইনের প্রস্তাবনায় দেশের সকল নাগরিকের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতাকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে মানুষের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আইনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, তথ্য অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, তথ্য অধিকার ফোরামের অন্যান্য সদস্য প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের পাশাপাশি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। আইনটি সংসদে গৃহীত হওয়া যতটুকু অর্জন, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এর বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের যথার্থ ভূমিকা পালন। এই উপলব্ধি থেকে টিআইবি তার সার্বিক কার্যক্রমে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছে।

তারই অংশ হিসেবে এই নির্দেশিকাটির প্রকাশ। ভারতের তথ্য অধিকার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত এই নির্দেশিকা বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট মহলের কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ উদ্যোগে সিএইচআরআই এর সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একইসাথে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য যারা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। প্রকাশনাটির পরবর্তী সংস্করণকে উৎকর্ষতর করার লক্ষ্যে পাঠকের পরামর্শ ও মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

সূচি

তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা ৫
শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছা ৫
'তথ্য যোদ্ধা' সৃষ্টি এবং সমর্থন ৬
তথ্য কর্মকর্তা ৭
মূল সংস্থা ৮
বাস্তবায়ন ইউনিট ৮
তথ্য কমিশন ৯
প্রশিক্ষণ ও উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশে উৎসাহ দান ৯
সরকার ও তৃণমূলের মধ্যে অংশীদারিত্ব গঠন ১২

একটি সহায়ক আইনি কাঠামো তৈরি ১৩
অসঙ্গতিপূর্ণ আইন বাতিল ১৩
পুরনো দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা ১৩
সরকারি চাকুরি নীতিমালা তথ্য প্রকাশে প্রতিবন্ধক ১৪
অন্যান্য আইনও সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন ১৪
তথ্য প্রকাশে সহায়ক আইন প্রণয়ন ১৫
কার্যকর উপ-ধারা ১৫
দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারকারীদের নিরাপত্তা ১৫
উন্মুক্ত সভা ১৬

কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ১৮
কর্মকর্তাদের জন্য সহায়িকা উপকরণ তৈরি ১৮
আইন মেনে চলার জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ২০
নথি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ২০
তথ্য সরবরাহের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ২২

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন: এগিয়ে চলা ২৫
রাজনৈতিক অঙ্গীকারের গুরুত্ব ২৫
তথ্য অধিকার আইনের জাতীয় বাস্তবায়ন কৌশল ২৫
স্বপ্রণোদিত তথ্য অধিকারের প্রাধান্য ২৬
একটি গতিশীল ও কার্যকর তথ্য কমিশন ২৬
গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিহার ২৮
তথ্য অধিকার-বান্ধব তথ্য ব্যবস্থা ২৯
তথ্য অধিকার-সহায়ক আইনি ব্যবস্থা ২৯
নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম ৩০

বাস্তবায়ন তদারকি ৩২
সংসদের জন্য বার্ষিক ও তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ৩২
সংস্কারের জন্য সুপারিশমালা ৩৪
নির্দিষ্ট বিরতিতে আইনের সংসদীয় পর্যালোচনা ৩৪

উপসংহার ৩৬
তথ্যসূত্র ৩৭
পরিশিষ্ট ১ .... ৩৯
পরিশিষ্ট ২ .... ৫৪
পরিশিষ্ট ৩ .... ৫৮
পরিশিষ্ট ৪ .... ৫৯
প্রয়োজনীয় লিংক ৬০

"তথ্য অধিকার আইনের অনুমোদন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা...। এটি সমাজ এবং প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে...। সরকার দেশের জনগণের তথ্য অধিকার সুরক্ষায় সবসময় কাজ করে যাবে।"[১]

– শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা

রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে তথ্য গোপন করার যে সংস্কৃতি প্রচলিত রয়েছে তা তথ্য উন্মুক্ততার ধারা প্রতিষ্ঠার গতিকে শ্লথ করে দেয়। খুব গভীরে গেঁথে যাওয়া তথ্য গোপন করার সংস্কৃতি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার দায় থেকে মুক্তি দেয় বলে তা থেকে বেরিয়ে আসা দুরূহ। তৎসত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করতে হলে জবাবদিহিতা ও তথ্য উন্মুক্ততার চেতনা নিয়ে এই আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য আইনটি প্রযোজ্য তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করার বিভিন্ন উপায় বের করতে হবে। নূন্যপক্ষে কর্মকর্তারা যাতে আক্ষরিক অর্থে এটি প্রয়োগ করে তার জন্য নতুন নতুন উপায় বের করা দরকার।

শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছা

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রাথমিক পর্যায়ের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে অনিশ্চিত ও দ্বিধান্বিত রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এমনকি যেখানে আইনসভা কর্তৃক এ আইন প্রণীত হয়েছে সেখানেও রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের মধ্যে এ আইনের কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারের দুর্বলতা থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তথ্য উন্মুক্ততার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব আইনটি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছে এক ধরনের নেতিবাচক ইঙ্গিত দেওয়ার মাধ্যমে এ আইনের কার্যকরতা ও যৌক্তিকতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বের স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এবং তথ্য প্রকাশকে উৎসাহিত করার যথাযথ ব্যবস্থা ছাড়া তথ্য প্রদানকে দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজের অংশ হিসেবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কতটুকু প্রাধান্য দেবেন সে ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে। এই কারণে মন্ত্রী, সাংসদ ও উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা একটি নতুন 'তথ্য উন্মুক্ততার ব্যবস্থা'র সূচনা করার জন্য স্বপ্রণোদিত হয় এবং সহযোগিতা প্রদান করে।

প্রথম ধাপ: কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি

নতুন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকারের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা পূরণের প্রমাণ হিসেবে একটি বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এ কর্ম-পরিকল্পনায় আইনটি বাস্তবায়নে মূল কাজ কী কী ও সেগুলো সম্পাদনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা সংস্থাসমূহ কারা এবং কাজগুলো সম্পাদনে নির্দিষ্ট সময়সীমা কী হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এই আইন নিয়ে সরকারের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সার্বিক দায়িত্ব দেশের প্রধান একটি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হলে তা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়। এতে নিশ্চিত হয় যে, সরকারের সব অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানে আইনের বাস্তবায়ন সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এটি আরও নিশ্চিত করে যে, আইন বাস্তবায়নে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। কেননা সকল সরকারি বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য মূল প্রতিষ্ঠানটি দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকে।

আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি সাধারণত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে নেতৃত্ব দেয়। তবে যেকোনো কর্ম-পরিকল্পনা সকলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে করে চূড়ান্ত পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে সরকার নিজস্ব উদ্যোগের অংশ হিসেবে মনে করবে। তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে এরকম প্রধান মন্ত্রণালয়গুলো, বিশেষ করে - কেবিনেট ডিভিশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা পুলিশ মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রাথমিক পর্যায় থেকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে এবং তারা যে বিষয়গুলো নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন সেগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে শুরুতেই তা সমাধান করতে হবে। যেকোনো পরিকল্পনার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে 'নির্দিষ্ট সময়সীমা'। বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপ সম্পাদনের জন্য স্পষ্ট করে তারিখ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মূল প্রতিষ্ঠানকে তখন এই সময়সীমা পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং যেকোনো ধরনের বিচ্যুতির অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজন হলে শাস্তি প্রদান করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

আইন বাস্তবায়নে সরকারের কালক্ষেপণ সাধারণভাবে একটি মিশ্র সংকেত পাঠায় এবং সরকারি কর্মকর্তাদের তাদের নতুন দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব প্রদানে আরো কম আগ্রহী করে তোলে। তবে একটি কার্যকর তথ্য প্রকাশ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সেই সাথে এটিও স্মরণ রাখতে হবে যে কালক্ষেপণ অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য প্রকাশের বিরুদ্ধে আমলাতন্ত্রের যে যুদ্ধ তারই বহিঃপ্রকাশ। আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বল্পতম কালক্ষেপণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা। এ দেশগুলোতে আইন পাশের এক বছরের মধ্যে এর প্রয়োগ শুরু হয়। অন্যদিকে অধিক কালক্ষেপণের উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাজ্যের কথা বলা যায়। এখানে আইনটি পাশ হওয়ার পর বাস্তবায়নের জন্য পাঁচ বছর সময় নেওয়া হয় সবকিছু 'গোছগাছ করতে'। কালক্ষেপণের সমস্যা যেন তৈরি না হয় সেজন্য আইনের মধ্যে এর বাস্তবায়নের জন্য স্পষ্ট সময়সীমা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জ্যামাইকার সরকারের বিশ্বাস ছিল যে এই আইনের সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। তাই তারা তাদের আইনের মধ্যে এর বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপ উল্লেখ করে। বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায় সম্পাদন করতে মূল মন্ত্রণালয়গুলো প্রথম বছরে ভূমিকা পালন করে এবং এর এক বছর পর অন্যান্য সংস্থা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায়।

আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সকলেই উপকৃত হতে পারে

বাংলাদেশের 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর ৮(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার পরিমল কুমার মুন্ডা অগ্রণী ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে এদেশের নাগরিকদের অ্যাকাউন্ট খোলা ও পরিচালনা সংক্রান্ত সরকারি সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশাবলীর কপি পাওয়ার আবেদন জানান। এই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারীকে উল্লিখিত তথ্যের কপি প্রদান করেন এবং একে (তথ্য অধিকার আইন) সরকারের একটি খুবই ভাল উদ্যোগ, যার মাধ্যমে সকলেই উপকৃত হতে পারবে বলে উল্লেখ করেন।

তথ্যসূত্র: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ (আরআইবি), বাংলাদেশ

যখনই একটি আইন তাৎক্ষণিকভাবে অথবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হয়, তখন আইন প্রয়োগে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ এবং মূল পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা (যেমন তথ্য কমিশন) কর্তৃক বাস্তবায়ন কার্যক্রম সতর্কতার সাথে পরিবীক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে এটি নিশ্চিত করতে হয় যে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র তাদের দায়িত্বে অবহেলা এবং তথ্য অধিকার কার্যকর করতে কালক্ষেপণ করছে না। আইন বাস্তবায়নের শুরুতেই ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা জরুরি। বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান রাজনৈতিক ইচ্ছাকে গতিশীল করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

'তথ্য যোদ্ধা' সৃষ্টি এবং সমর্থন

তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকার এবং সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের অঙ্গীকার ও সম্পৃক্ততার প্রয়োজন হলেও পূর্বের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সরকারের ভেতরে ও বাইরে 'তথ্য যোদ্ধা' শনাক্ত করা, এমনকি সৃষ্টি করাও একটি সহায়ক উদ্যোগ হতে পারে। পদ্ধতিগত পরিবর্তন ঘটার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ, সরকারি সংস্থার কার্যক্রমের মূল্যায়ন, এবং আইনটি সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা ও জনসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এ উদ্যোগ সহায়ক হতে পারে। সরকারি প্রশাসনযন্ত্র এবং জনগণ তথ্য যোদ্ধাদের বিবেচনা করবে উন্মুক্ত সরকারের প্রবর্তক গোষ্ঠী বা সংস্থা হিসেবে। এই ভূমিকা পালনের জন্য নির্দিষ্ট পদ তৈরি অথবা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানকে তথ্য যোদ্ধা হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান একটি সুবিবেচনাপ্রসূত কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া, ধারাবাহিকতা ধরে রাখা, এবং এ আইনের অধীনে অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাদের কার্যক্রম মূল সংস্থা পর্যবেক্ষণ করছে কিনা তা নিশ্চিত করবে।

তথ্য কর্মকর্তা

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সংক্রান্ত আবেদনপত্র গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা থাকা প্রয়োজন। তথ্য কর্মকর্তা তার নিজস্ব সংগঠনে আইন প্রয়োগের মুখ্য সমন্বয়কারীও হতে পারেন। পাশাপাশি উক্ত সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তারাও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য কর্মকর্তার দ্বারস্থ হতে পারে। একজন নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করা একটি সহায়ক কৌশল শুধুমাত্র এ কারণে নয় যে অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাদের দক্ষতা তৈরি এবং উন্নয়নের জন্য তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে, বরং এ কারণে যে কর্মকর্তারা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির কাজে দক্ষ সেনানী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

অন্য কোনো বিভাগ বা পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তার কাছ থেকে আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানার চেয়ে নিজ প্রতিষ্ঠানের একজন যে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং যার ওপর সহকর্মীদের আস্থা রয়েছে সেই ব্যক্তিই তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে ভালো ভূমিকা পালন করতে পারে। তথ্য কর্মকর্তা যাতে তার দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করতে পারে সেজন্য সরকারকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, এই দায়িত্ব সম্পাদন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং সব ধরনের সম্পদ আছে। পাশাপাশি এও নিশ্চিত করতে হবে যে, সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের নিজস্ব পদোন্নতি এবং পুরস্কৃত করার ব্যবস্থার মধ্যে তাদের এ নতুন ভূমিকা স্বীকৃতি পায়।

কুতুবদিয়া দ্বীপের মানুষের অধিকার আদায়ে সাহায্য করেছে তথ্য অধিকার আইন

মো. রফিকুল ইসলাম (৪৩) বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার লেমশিখালি ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা। তিনি কৃষি এবং স্থানীয় মানুষের জন্য সমাজসেবামূলক কাজের সাথে জড়িত। 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর কাছ থেকে কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি) কুতুবদিয়ায় একটি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। রফিকুল ইসলাম এ প্রকল্পের সাথে একজন 'পরিবর্তন অনুঘটক' হিসেবে জড়িত। তিনি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত সুশাসন ও সামাজিক জবাবদিহিতা সংক্রান্ত দু'টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন। রফিকুল ইসলাম নিজেকে একজন সচেতন এবং দরিদ্রদের অধিকার আদায়ের সক্রিয় কর্মী হিসেবে মনে করেন।

২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে রফিকুল ইসলাম জানতে পারেন যে, সরকার লেমশিখালি ইউনিয়নের বাসিন্দাদের মধ্যে ভিজিএফ (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে চাল বিতরণ করবে। তিনি কুতুবদিয়া উপজেলার প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার (প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন অফিসার) কাছে বরাদ্দকৃত চালের পরিমাণ এবং কতজনকে এ চাল দেওয়া হবে তা জানতে চান। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা এ সংক্রান্ত তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে রফিকুল ইসলাম উক্ত কর্মকর্তার সাথে তার অফিসে দেখা করেন এবং বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী উল্লিখিত বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব। পরবর্তীতে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা তাকে জানান যে, লেমশিখালি ইউনিয়নের মোট ২৭২৫ জন লোকের জন্য মাথাপিছু ১০ কেজি চাল বরাদ্দ করা হয়েছে।

চাল বিতরণের দিন দেখা গেল, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৭ কেজি করে চাল দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এদিকে রফিকুল ইসলাম আগেই সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, প্রত্যেকের জন্য ১০ কেজি করে চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা জেনে সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং বরাদ্দের পুরোটা দাবি করে। চালের বহন খরচ এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যয় পুষিয়ে নেওয়ার জন্য প্রত্যেককে সম্পূর্ণ বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। অধিকার-সচেতন জনগণের প্রতিবাদের মুখে চেয়ারম্যান প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাড়ে নয় কেজি করে চাল দিতে বাধ্য হন। আর এই ঘটনাটি প্রমাণ করে কীভাবে তথ্য অধিকার আইন দরিদ্র জনগণের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

তথ্যসূত্র: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

মূল সংস্থা

সাধারণত সরকার কোনো একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তথ্য প্রাপ্তি আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়ে থাকে। যুক্তরাজ্যে সংবিধান তদারকি বিভাগ এই ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে উগান্ডায় এই কাজটির নেতৃত্ব দেয় তথ্য মন্ত্রণালয়। এ ধরনের যে কোনো সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানের জন্যই তাদের নতুন দায়িত্ব সম্পাদনে আর্থিক, কারিগরি ও অন্যান্য সক্ষমতা থাকা দরকার। আইনটি বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষ করে নতুন নির্দেশনা উপকরণ প্রকাশ, প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রস্তুত এবং তথ্য ব্যবস্থা তৈরির সময় অতিরিক্ত লোকবলের প্রয়োজন হতে পারে। নতুন কর্মকর্তাদের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন এবং কাজটি করতে যে ধরনের দক্ষতা থাকা দরকার তার ওপর ভিত্তি করে নিয়োগ দেওয়া উচিত। প্রশাসন থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে দায়িত্ব দেওয়া কখনোই কাম্য নয়। নিয়োজিত কর্মকর্তার নিজস্ব উদ্যোগে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে কাজ করার দৃষ্টান্ত, চলমান কর্মসূচির জন্য প্রশিক্ষণ, পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, ই-গভর্নেন্স অথবা নথি ব্যবস্থাপনার ওপর অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। যদি বিভাগীয় বাজেট ইতোমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়ে থাকে তাহলে তা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ এই খাতে বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।

বাস্তবায়ন ইউনিট

বিভাগীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, তথ্য প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা শনাক্তকরণ, সবচেয়ে ভালো ও সবচেয়ে দুর্বল কার্যক্রম যাচাই, নির্দেশনা দান ও প্রশিক্ষণ প্রদান, আইনের মানদণ্ড নির্দেশ করে এমন রায়ের তথ্য বিতরণ, এবং সংস্কারের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সরকার কখনো কখনো বিশেষ ইউনিট গঠন করে থাকে। এ ধরনের ইউনিট জনসচেতনতা সৃষ্টির যোগাযোগ উপকরণ তৈরি এবং প্রচারণামূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য মানবাধিকার কমিশনের ওপর তথ্য প্রাপ্তি বিষয়ে ব্যবহারিক নির্দেশিকা তৈরি এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত দায়িত্ব রয়েছে। এছাড়া এ কমিশন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার তথ্য ও নথিপত্রের (আইন দ্বারা নির্ধারিত) তালিকার ভান্ডার হিসেবে ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচি পরিচালনা, জনগণের তথ্য অনুরোধে সহায়তা দান, আইনের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে থাকে।[২] তবে দুর্ভাগ্যবশত এসব দায়িত্ব সম্পদের প্রাপ্যতার ওপর নির্ভরশীল। সম্পদের ঘাটতি সমস্ত কাজ স্থবির করে দিতে পারে।

তথ্য উন্মুক্ততাকে বাস্তবতায় রূপান্তর: তথ্য স্বাধীনতা ইউনিট স্থাপন

জ্যামাইকা সরকার প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অধীনে একটি তথ্য প্রাপ্তি ইউনিট গঠন করে। এ ইউনিটটি আইন বাস্তবায়ন এবং কার্যকর করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। দুর্ভাগ্যবশত, ইউনিটটিতে সম্পদের অপর্যাপ্ততা এবং কর্মীর অভাব ছিল যা একে কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে এ ইউনিটের চমৎকার একটি সৃষ্টিশীল উদ্যোগ ছিল তথ্য প্রাপ্তি বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস্ প্রতিষ্ঠা করা। এ অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন সংস্থার তথ্য কর্মকর্তাদের একত্রিত করে। এখানে তারা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিয়মিতভাবে আলোচনা এবং ভাল ও অনুকরণীয় উদ্যোগগুলোর ওপর মতবিনিময় করত। অনুরূপভাবে, স্কটল্যান্ডে স্কটিশ নির্বাহী বিভাগ তথ্য স্বাধীনতা বাস্তবায়ন গ্রুপ গঠন করে। এ গ্রুপটি নির্বাহী বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সরকারের অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত হয়। স্কটল্যান্ডে 'তথ্য স্বাধীনতা আইন' বাস্তবায়ন হওয়ার চার বছর আগে ২০০১ সালে এ গ্রুপটি গঠিত হয় এবং এটি এ আইনের বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সহায়তা করে।

২০০১ সালে ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগোতে তথ্য স্বাধীনতা ইউনিট গঠিত হয়। এ ইউনিটটি তথ্য স্বাধীনতা আইনের আওতাধীন সরকারি কর্তৃপক্ষকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে এবং জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। এ ইউনিটটি নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করে:

- গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের জন্য সেমিনার আয়োজন;
- তথ্য স্বাধীনতা প্রসঙ্গে ওয়েবসাইট তৈরি;
- সরকারি কর্তৃপক্ষের জন্য সিডিতে ম্যানুয়াল তৈরি;
- আইনের ব্যাখ্যা সম্বলিত তথ্য-পুস্তিকা ডাকযোগে বাড়ি বাড়ি প্রেরণ;
- রেডিও ও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান তৈরি, আইনের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপানো, এবং জনগণের অধিকার ও দায়িত্ব এবং সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে পোস্টার ছাপানো;

- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় "Freedom of Information (FOI) Caravan" এর মাধ্যমে প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ। এ প্রচারণা কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশব্যাপি জনগণকে তথ্যের স্বাধীনতা বিষয়ে সচেতন ও সংবেদনশীল করতে অনুষ্ঠান পরিচালনা; এবং
- সরকারি সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মীদের সচেতন ও সংবেদশীল করতে অনুষ্ঠান পরিচালনা (৯০টিরও বেশি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়)।[৩]

তথ্য কমিশন

তথ্য প্রাপ্তি বা তথ্য অধিকার আইনের অধীনে নবগঠিত তথ্য কমিশনগুলো প্রায়ই নতুন তথ্য প্রাপ্তি ব্যবস্থার মধ্যে 'তথ্য যোদ্ধা' হিসেবে ভূমিকা পালনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তথ্য কমিশন 'দলিল বা নথি পাওয়ার অনুরোধ বা প্রাপ্তি'[৪] সম্পর্কিত যে কোনো অভিযোগ ও আপিল যাচাই সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করে। কমিশনের কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের চাহিদা বাস্তবায়নে অথবা তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগে ব্যর্থতা, এবং তথ্য উন্মুক্ত না করার বিরুদ্ধে আপিল যাচাই। যুক্তরাজ্য ও স্কটল্যান্ডের তথ্য কমিশনাররা সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা উপকরণ তৈরির কাজে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

তথ্য কমিশনার সাধারণত তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উন্নতি সাধন করার জন্য সুপারিশ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এরূপ কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য তথ্য কমিশনকে যথাযথ সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতে আইন বাস্তবায়নের প্রথম ছয় মাসে বেশ কয়েকটি রাজ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য কমিশন স্থাপিত হয়নি। অন্যান্য রাজ্যের তথ্য কমিশন নামমাত্র কর্মী, গুটিকয়েক কম্পিউটার এবং ছোট পরিসরের অফিস নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে বাংলাদেশ সরকার তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি করে। ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস হয় এবং ১ জুলাই থেকে এটি কার্যকর হয় (পরিশিষ্ট ১ ও ২ দেখুন)। আইন অনুযায়ী ইতোমধ্যে সরকার তথ্য কমিশন গঠন করেছে।[৫] তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ হিসেবে তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে নিজস্ব ওয়েব সাইট চালু করেছে (পরিশিষ্ট ৩ দেখুন)।

প্রশিক্ষণ ও উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশে উৎসাহ দান

সকল সরকারি কর্মকর্তার দায়িত্ব হচ্ছে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে কাজ করা। তবুও বাস্তবে দেখা গেছে যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইতিবাচক পরিবর্তনকে সমর্থন করা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্রের বিদ্যমান জটিল কাঠামো তথ্য প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমনকি যেসব দেশে অনেক বছর ধরে তথ্য প্রাপ্তির আইন বিদ্যমান আছে সেখানেও আমলাতান্ত্রিকতা সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ায় তথ্য স্বাধীনতা আইন পাশ হওয়ার ১৩ বছর পরে সেখানকার আইন সংস্কার কমিশনের মন্তব্য থেকে: "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এ আইনটি আমলাতন্ত্রের কাছে এখনও সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয়নি। 'স্বচ্ছ সরকার' এর ধারণাটির ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের মাঝে এক ধরনের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব রয়েছে। কিছু কিছু পর্যবেক্ষকের মতে তথ্য স্বাধীনতা আইনের সাথে সরকারি খাতের ইতিবাচক সম্পর্কের জন্য হয়তো এক প্রজন্ম অপেক্ষা করতে হবে"।[৬]

তথ্য কমিশনের তথ্য প্রকাশের নজির স্থাপন

একটি নতুন আপিল প্রতিষ্ঠান হিসেবে তথ্য কমিশন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য না দেওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করে। তথ্য অধিকার আইনে বিধৃত 'তথ্য প্রকাশের চেতনা' ধারন করে তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত যে কোনো বিরোধ নিরসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশনের দায়িত্ব অসীম। তাই বিশেষ করে বাস্তবায়নের প্রথম দিকে আইন তৈরির সময় যে বিষয়গুলোতে সন্দেহ রয়েছে তা স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে নজির সৃষ্টিতে কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতে তথ্য প্রাপ্তি আইন অনুযায়ী সরকারি নথিপত্রে কর্মকর্তারা যেসব ফাইল নোট লেখেন তা জনগণ চাইলে পেতে পারেন- এ ধরনের একটা নতুন বিধি নিয়ে বির্তক ছিল।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য এ আইন বাস্তবায়নে মূল সংস্থা হচ্ছে কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। এ বিভাগের ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ফাইল নোটিং সংক্রান্ত তথ্য না পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। তবে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে যখন একটি অভিযোগ পাঠানো হয় তখন কমিশন এসব ফাইল নোট 'তথ্যের সংজ্ঞা' দ্বারা সংজ্ঞায়িত এবং প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দেয়। এ সিদ্ধান্ত ছিল তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের প্রতি কমিশনের একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত। এর মাধ্যমে কমিশন সরকারের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করতে পেরেছিল সেই ইঙ্গিতও দেয়। পাশাপাশি সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের উচ্চ পর্যায়ের যেসব কর্মকর্তা গোপনীয়তা রক্ষাকে সমর্থন করে তাদের বিরোধিতা করার জন্যও তারা প্রস্তুত বলে জানিয়ে দেয়।

সঠিক সময়ে প্রশিক্ষণ শক্ত ভিত গঠন করে

২০০২ সালে জ্যামাইকাতে তথ্য প্রাপ্তি আইন পাশ হয়। আইনের বাস্তবায়ন শুরুর আগেই জ্যামাইকা সরকার একটি তথ্য প্রাপ্তি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার মৌলিক দিকসমূহ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা ও আইনটির বিস্তারিত বিষয় নিয়ে এ ইউনিটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রথম পর্ব শুরু হয় ২০০৩ থেকে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪০০ কর্মকর্তাকে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এনজিও কর্মকর্তাদের সেশন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।[১১] যদিও ভারতের তথ্য অধিকার আইনটি তুলনামূলকভাবে নতুন, তথাপি কর্মকর্তাদের জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে বেশকিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 'ইয়াশাদা' কর্মকর্তাদের পুরনো রাজ্য আইন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদানে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। তারা সকল সরকারি তথ্য কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং পরবর্তীতে সমগ্র রাজ্যের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়। এভাবে তারা তিন বছরে চার হাজারেরও বেশি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়। পরবর্তীতে ইয়াশাদা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নতুন তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ সূচি প্রণয়ন করে। জ্যামাইকা ও ভারতের এই সময়োচিত প্রশিক্ষণ তাদের নিজ নিজ দেশের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সহজ ও মসৃণ করেছে।

তথ্য অধিকার সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত ও স্পষ্ট ধারণা লাভ এবং সহযোগিতা ও সমর্থন ছাড়া এ আইন বাস্তবায়নে তাৎপর্যপূর্ণ ও টেকসই উন্নয়ন হতে পারে না। নির্দিষ্ট বা নিদের্শিত আইন এবং তৎপরবর্তী পদক্ষেপ অধিকারের সঠিক সংজ্ঞায়ন এবং আইন না মানার প্রবণতা হ্রাস করার সহায়ক। তবে এ পদক্ষেপগুলো কম কার্যকর। তথাপি, তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করতে হবে। এটি হওয়া উচিত এ আইনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।[১২]

যেহেতু তথ্যের জন্য 'অনুরোধ' বা 'তথ্য চাওয়া' কোনো প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, দুর্নীতি প্রকাশ করতে পারে অথবা সম্ভাব্য নীতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে[৭] সেহেতু এর প্রতি সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য দেওয়া থেকে শুরু করে দুর্বল বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করা এবং অপ্রতুল সম্পদের অজুহাত দেখিয়ে তথ্যের অনুরোধকে পাশ কাটানোর মাধ্যমে তথ্য অনুরোধকারীকে হেনস্থা করা পর্যন্ত হতে পারে। কখনো কখনো সরকারি কর্মকর্তারা নথি থেকে তথ্য সরিয়ে, তথ্য বিকৃত করে এবং দলিল নষ্ট করার মাধ্যমে আইনি সীমা লঙ্ঘন করে। এ ধরনের কার্যকলাপ মোকাবেলা করার জন্য কানাডায় তথ্য প্রাপ্তি আইন সংশোধন করতে হয়েছে এবং তথ্য নষ্ট, বিকৃতি, ভুলভাবে উপস্থাপন, পরিবর্তন এবং গোপন করার অপরাধের জন্য শাস্তি আরোপের বিধান রাখা হয়েছে।[৮] আমলারা শেষ মুহূর্তে তথ্য প্রদান, হাস্যকর অজুহাতে তথ্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান এবং অন্তহীন আপিল অথবা আদালতের দ্বারস্থ হয়ে তথ্য প্রকাশ বাধাগ্রস্ত করার মাধ্যমে পরোক্ষ ও অন্যায্যভাবে তথ্য অধিকার আইন মেনে চলাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, কর্মকর্তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ভালভাবে ধারণা লাভ করেছেন এবং তারা তথ্য প্রকাশের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। আইনটিতে তথ্য অধিকার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে এবং তথ্য, নথি ও দলিল ব্যবস্থাপনার জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে এবং কীভাবে তথ্য বিতরণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো জানা দরকার। একটি সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সরকারি চাকুরির অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ হিসেবে সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে ভূমিকা পালনের ওপর জোর দেয়।[৯] যে মনোভাব সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে প্রশিক্ষণ অবশ্যই তা পরিবর্তনের ওপর জোর দেবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের ভেতরে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সৃষ্টির প্রবণতা লাঘব করতেও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে।[১০]

তথ্য অধিকার আইন বর্তমান মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তন সূচনা করে বিধায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং সব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। তবে সবার আগে প্রশিক্ষণ দিতে হবে তথ্য কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষকে। এক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও অনুরোধ নিয়ে কাজ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল তথ্য কর্মকর্তা এবং আপিল নিয়ে কাজ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল আপিল কর্তৃপক্ষকে কীভাবে আবেদনপত্র অথবা আপিল সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করতে হয় এবং কীভাবে আইনটি প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করতে হয় তার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে। আইন বাস্তবায়নের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তথ্য কর্মকর্তারা সামনের দিকে থাকেন বিধায় তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ বা আবেদন নিয়ে জনগণ তাদের কাছেই প্রথমে যায়। এজন্য তাদের এ আইনটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা দরকার যাতে করে তারা সাধারণ মানুষসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। তথ্য কর্মকর্তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে গৃহীত হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় আপিল কর্তৃপক্ষেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। ফলে

আইনটির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়, বিশেষ করে অব্যাহতির ধারা জানার জন্য তাদের নিবিড় প্রশিক্ষণের দরকার, কেননা আইন সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের সমস্যা বা মতবিরোধ দূর করার জন্য তাদেরকেই প্রথমে ডাকা হবে। এজন্য তথ্য কর্মকর্তারা যেন ভুল প্রক্রিয়ায় কোনো আবেদন নাকচ না করে তা নিশ্চিত করতে আপিল কর্তৃপক্ষকে জানতে হবে কখন অব্যাহতির ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে বা কখন তা করা যাবে না।

তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়ার আগেই প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ তথ্য প্রকাশের প্রতি সরকারের অঙ্গীকার প্রমাণ করে। ২০০১ সালে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নেরও আগে ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগোতে মন্ত্রী, স্থায়ী সচিব, মন্ত্রণালয়ের বিভাগসমূহের প্রধান এবং গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য সংবেদনশীলতা সৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে যে কোনো প্রশিক্ষণ হবে একটি চলমান প্রক্রিয়া। নতুন কর্মীদের পরিচিতিমূলক কোর্সে থাকবে উন্মুক্ততার বিষয়। অন্যদিকে ক্যারিয়ার মধ্যবর্তী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তথ্য অধিকার আইনের নানা বিষয়। প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষণ সূচিতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর অধিবেশন অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। অন্যদিকে আইন বাস্তবায়নের কিছুদিন পরও কর্মীদের মধ্যে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে কখনো কখনো অস্পষ্টতা অথবা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রশ্ন তৈরি হতে পারে। তাই তাদেরকে নিয়মিতভাবে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ দিতে হবে এটা নিশ্চিত করার জন্য যে, তারা যেন জানতে পারে তাদের কী করতে হবে। আইনের বাস্তবায়নকালে নানা সমস্যা চিহ্নিত করা যায়। এসব সমস্যা নিয়ে কর্মীদের সাথে আলোচনা করা এবং সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হয়। জনসাধারণ এবং কর্মীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে কী ধরনের সমাধান হতে পারে তা জানার জন্য যে কোনো প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। তথ্য কমিশন অথবা আদালত দ্বারা সমস্যা সমাধানের অথবা তথ্য প্রাপ্তির অন্য যে কোনো প্রসঙ্গে যে ইতিবাচক নজির সৃষ্টি হয় তা প্রশিক্ষণ সূচিতে সংযোজন করা প্রয়োজন।

তথ্য প্রকাশ উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা

আদর্শগতভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের যে কোনো প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বিস্তৃততর উন্মুক্ততার অংশ হিসেবে দেখা হয়। এ আইনের অধীনে কর্মকর্তাদের নতুন দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব বোঝাতে তাদের চাকরির অন্যতম শর্ত হিসেবে চুক্তিতে প্রশিক্ষণ রাখা যায়। এটি হবে কর্মদক্ষতা যাচাইয়ের একটি মাপকাঠি। প্রকৃতপক্ষে কর্মকর্তারা তাদের নতুন দায়িত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার একটি কার্যকর কৌশল হতে পারে সঠিক প্রণোদনা। তথ্য কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের চাকরির চুক্তিনামায় তাদের ওপর যে নতুন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা উল্লেখ থাকা দরকার, যাতে তারা দায়িত্ব পালনের জন্য পুরস্কৃত হতে পারে এবং তাদের ওপর অর্পিত কর্তব্য পালনে নিজেকে নিবেদিত করার আত্মবিশ্বাস জন্মে। অন্যদিকে সরকারের বিভাগগুলোকে তথ্য প্রকাশের জন্য পুরস্কৃত করা উচিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিভাগের প্রধানদের সাফল্য যাচাই করে বোনাস দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া তথ্য প্রকাশে যেসব কর্মকর্তা কাজ করছে তাদেরকে ব্যক্তিগত পর্যায়েও পুরস্কৃত করা যায়। এক্ষেত্রে বার্ষিক 'তথ্য প্রকাশের অ্যাওয়ার্ড' চালু করা যেতে পারে। আইন বাস্তবায়ন না করার জন্য আইনগতভাবে শাস্তি বিধানের পাশাপাশি কর্মকর্তারা যাতে তাদের নতুন দায়িত্ব পালনকে প্রাধান্য দেয় এবং কার্যকরভাবে তা সম্পাদন করে - এ বিষয়টিকে উৎসাহিত করতে পুরস্কার ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সরকার ও তৃণমূলের মধ্যে অংশীদারিত্ব গঠন

জনগণের তথ্য অধিকার সত্যিকার অর্থে কার্যকর করতে হলে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদার প্রতিফলন থাকা জরুরি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, একটি ভাল কৌশল সরকার-তৃণমূল অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ভারতে কিছু পুরনো প্রাদেশিক আইন অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে তথ্য অধিকার কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়েছে। এসব কাউন্সিল তথ্যের অধিকার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং তথ্য প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সরকারের কাছে সুপারিশ প্রস্তাব করে।[১৩]

জ্যামাইকা সরকারের তথ্য প্রাপ্তি ইউনিট একটি 'স্টেকহোল্ডার উপদেষ্টা কমিটি' গঠন করে। এ কমিটি নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। এই কমিটি ইউনিটের পরিচালকের সাথে প্রতি মাসে সভায় মিলিত হয়, এমনকি মাঝে মাঝে মন্ত্রীর সাথেও সাক্ষাৎ করে। পরিচালক বা মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য অধিকার কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি পরিবীক্ষণ বৃদ্ধি, ভাল দৃষ্টান্তগুলো সরকারের কাছে সুপারিশ হিসেবে উপস্থাপন, এবং তথ্য প্রাপ্তি ইউনিটকে সহায়তা করা। উল্লেখ্য, এ ধরনের পরিবীক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করতে হলে সরকারের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রয়োজন, যারা নাগরিক সমাজের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং তাদের সুপারিশগুলো নিয়ে কাজ করবে।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সরকারের আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সহায়তায় বা যৌথ উদ্যোগেও করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকায় তথ্য কর্মকর্তা ও উপ-তথ্য কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সাউথ আফ্রিকান হিউম্যান রাইটস কমিশন জাসটিস কলেজ এবং ওপেন ডেমোক্রেসি অ্যাডভাইস সেন্টার (একটি এনজিও)। জ্যামাইকায় সরকারের তথ্য প্রাপ্তি ইউনিটটি রেকর্ডস ও আর্কাইভস ডিপার্টমেন্ট এবং ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বেশকিছু প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে। যুক্তরাজ্যের 'আর্টিকেল নাইনটিন' নামের একটি এনজিও 'মডেল হ্যান্ডবুক অন রাইট টু ইনফরমেশন ট্রেনিং ফর পাবলিক অফিসিয়াল' তৈরি করে যা সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য স্থানীয় ট্রেনিং মডিউল তৈরিতে ব্যবহৃত হত।

প্রশিক্ষণে এনজিওদের কাজে লাগানো

ভারতে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 'প্রশিক্ষণ কর্মসূচি' হচ্ছে সরকার-এনজিও অংশীদারিত্বের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহারাষ্ট্রে ইয়াশাদা নামের একটি প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সরকারি কর্মকর্তাদের বিভিন্ন আইনের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রায়ই তথ্য অধিকার কর্মীদের সহায়ক হিসেবে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তথ্য অধিকার কর্মীরা এ প্রশিক্ষণে এসে কর্মকর্তাদের সাথে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিনিময় করে এবং যেসব সমস্যার মুখোমুখি তারা হয়েছিল তার বাস্তব প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করে। পাশাপাশি তারা কর্মকর্তাদের কাছে তাদের প্রত্যাশা কী সেটিও জানায়। ২০০৫ এর মে মাসে কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) একটি জাতীয় বাস্তবায়ন সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কর্মকর্তাসহ সমগ্র ভারতের সরকারি কর্মকর্তা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তরখন্ড, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মিজোরাম, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, দিল্লী, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের রাজ্য সরকার সিএইচআরআই-কে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ইতোমধ্যে ছয় হাজারের বেশি সরকারি কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি খাতের প্রায় ৬৫০ জন উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের নির্বাহীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে সিএইচআরআই।

একটি সহায়ক আইনি কাঠামো তৈরি

তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আইনগত এবং নীতি নির্ধারণী পদক্ষেপের অংশ হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন। তথ্যের উন্মুক্ততা তখনই সম্ভব হয় যখন তথ্য অধিকার আইন অন্যান্য বিপরীতধর্মী আইনগুলোকে বাতিল বা অগ্রাহ্য করে। সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানকে এটি সুস্পষ্ট করে জানাতে হবে যে সবকিছু আগের মত চলবে না। এজন্য স্বচ্ছ শাসন ব্যবস্থার চেতনা তৈরি করতে সব ধরনের সামঞ্জস্যহীন আইনি ধারা বাতিল অথবা কমপক্ষে সংশোধন করা প্রয়োজন। পুরনো শক্তিশালী আইন, বিশেষ করে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন হয় বাতিল নয়তো পুরোপুরি সংশোধন করা দরকার। এছাড়া সমাজে তথ্য প্রকাশের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক আইন এবং অন্যান্য নিয়ম-কানুনও প্রণয়ন করার প্রয়োজন হতে পারে।

অসঙ্গতিপূর্ণ আইন বাতিল

গোপনীয়তার আইনের কারণে কখনো কখনো সরকারি কর্মকর্তারা নতুন তথ্য অধিকার আইনের অধীনে ঠিক কী মাত্রায় তথ্য প্রকাশ করতে হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভোগে। দেখা গেছে যে, কোনো কোনো আইন তথ্য প্রকাশের কথা বলে, আবার একই সময়ে অন্য আইন তথ্য প্রকাশের জন্য বিচারের সম্মুখীন হওয়ার হুমকী দেয়। এসব ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকে। বর্তমান বিশ্বে যেসব গোপনীয়তার আইন এখনো বিদ্যমান সেগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং ততখানি কার্যকর থাকছে না। তবে এসব কাগজে কলমে বহাল থাকা আইন ধীরে ধীরে প্রশাসনের 'তথ্য-বিনিময়' কার্যক্রমকে গতিহীন করে তুলতে পারে।

পুরনো দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা

অতীতে একটি আবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য যে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন তৈরি করা হয়েছিল তা এখনো পৃথিবীর অনেক দেশে বিদ্যমান। এ আইন যে কোনো ধরনের তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকে। এটি অন্যায় কাজের ঝুঁকি গ্রহণে অনুমোদন দেয় এবং প্রায়ই এমন বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে যেকোনো ধরনের যোগাযোগই শাস্তিযোগ্য হতে পারে। এসব আইন সমাজে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণ এবং গুপ্তচরবৃত্তির মতো মারাত্মক অপরাধ সৃষ্টির সুযোগ করে, যা দমন করার জন্য আবার কঠোর শাস্তি প্রয়োগ করতে হয়। যার ওপর ভিত্তি করে সরকারি নথিকে যেভাবে 'সংরক্ষিত', 'গোপনীয়' অথবা 'বিশেষ গোপনীয়' ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়, তা কিসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি বা প্রয়োগ করা হয় সেই সম্পর্কে কেউ ভালো করে জানে না অথবা কেউ প্রশ্নও তোলে না।

তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তিত হলেও সরকারের কিছু কিছু তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সফল উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অন্য যেসব তথ্য গোপন করার আইন আছে তার ঊর্ধ্বে নতুন আইনকে স্থান দিতে হবে। গোপনীয়তার আইনি ধারাগুলো সুসংবদ্ধ ও দ্ব্যর্থকতাহীন ভাষায় রচিত হবে এবং অবশ্যই সতর্কতার সাথে নিশ্চিত করতে হবে যে কিছু সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতেই কেবল এগুলো প্রয়োগ করা যাবে। দুর্ভাগ্যবশত ঔপনিবেশিক শাসন-পরবর্তী কমনওয়েলথভুক্ত বেশকিছু দেশে পুরনো এ ধরনের গোপনীয়তার আইন এখনো অপরিবর্তিতভাবে চালু রয়েছে। আইনে যেসব তথ্য বা দলিলপত্রকে 'গোপনীয়' বলা হচ্ছে তার দোহাই দিয়ে সাধারণ তথ্য বা দলিলপত্রকেও গোপনীয়তার মধ্যে ফেলা হয়। বাংলাদেশে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা ফাঁস হওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করার অজুহাতে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের অধীনে কয়েকটি সংবাদপত্রের সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়।[১৪] একজন মন্ত্রী এবং একজন মুখ্যমন্ত্রীর ওপর প্রণীত দুর্নীতিবিরোধী সংস্থার দু'টি প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু গণমাধ্যমে প্রকাশ

করে দেওয়ার অপরাধে মালয়েশিয়ায় বিরোধী দলের একজন রাজনীতিককেও ২০০২ সালে দুই বছরের জন্য জেল হাজতে পাঠানো হয়।[১৫]

সরকারগুলো এখনো চায় মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে আনুগত্য প্রদর্শনের অঙ্গীকার অথবা গোপনীয়তা রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করুক। যদিও কাজের ক্ষেত্রে একটা পর্যায়ে গোপনীয়তা রক্ষার মূল্য আছে তবু তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দ্বিধান্বিত করতে পারে। তাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে: তাদের দায়িত্ব কি শুধুই উর্ধ্বতনদের জন্য, নাকি তারা জনগণের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব দ্বারা পরিচালিত? আধুনিক গণতন্ত্রে গোপনীয়তা রক্ষার শপথ নেওয়ার বদলে তথ্য প্রকাশের শপথ গ্রহণ করা দরকার, না হলে এই গোপনীয়তার শপথ সরকারি কর্মীদের মধ্যে এ ধারণা তৈরি করতে পারে যে কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে তথ্য প্রকাশের বিরুদ্ধতা আশা করে।

সরকারি চাকরি নীতিমালা তথ্য প্রকাশে প্রতিবন্ধক

সরকারি চাকরি নীতিমালায় এমন অসংখ্য নীতি আছে যা ‘দায়িত্বপ্রাপ্ত বা অনুমতিপ্রাপ্ত না’ হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে সরকারি কর্মচারীদের তথ্য প্রকাশে বাধা দেয়। এটি এমন গভীরে প্রোথিত যে স্বাভাবিকভাবেই আমলারা তথ্য প্রকাশের ঝুঁকির চেয়ে তথ্য প্রকাশ না করার ঝুঁকি নিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক নির্দেশিকায় উল্লেখ আছে যে, কর্মচারীরা তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনুমতি ছাড়া সাধারণ জনগণ বা গণমাধ্যমের কাছে কোনো ধরনের তথ্য প্রকাশ করতে পারবে না। অন্যদিকে যেহেতু তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে, তাই সকল সরকারি চাকরি নীতি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি নতুন আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে এর সংশোধন দরকার। যদি পরস্পরবিরোধী আইন থেকে যায় তাহলে অনুসরণীয় নিয়ম-কানুন পালন করতে গিয়ে কর্মকর্তারা দ্বিধায় পড়তে পারে। অনেক দেশে ‘সরকারি চাকরি নীতিমালা’ সাধারণ মানুষ এবং গণমাধ্যমকে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ীও তথ্য প্রদানে কর্মকর্তাদের বাধা দেয়। এ ধরনের তথ্য গোপন করার আইন বা ধারা ‘তথ্য অধিকার আইন’ প্রণীত হওয়ার পর থাকা উচিত নয়।

তথ্য গোপন ও তথ্য প্রকাশের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব

২০০২ সালে জ্যামাইকার সরকার তথ্য প্রাপ্তি আইন প্রণয়ন করার পরও পুরনো ‘দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ১৯১১’ বাতিল করা হচ্ছিল না। এক্ষেত্রে সেই দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এ বিষয়টি স্পষ্ট করেন যে, পুরনো আইনটির পরিবর্তে যে নতুন আইন পাশ হয়েছে তার অধীনে যেকোনো ধরনের তথ্যের উন্মোচন দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের কোনো ধারার লঙ্ঘন হিসেবে পরিগণিত হবে না। তথাপি দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন বহাল রাখার সিদ্ধান্ত সরকারি তথ্য প্রকাশের চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক এবং নতুন আইনের জন্য হুমকি হিসেবে থেকে যায়। অন্যদিকে অচল, নৈরাশ্যজনক একটি আইন বহাল রাখা আবার প্রমাণ করে গভীরে গেঁথে যাওয়া আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন কতটা দুরূহ।[১৬]

অন্যান্য আইনও সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন

উপাত্ত সংরক্ষণ, গোপনীয়তা রক্ষা এবং তথ্য উন্মোচন- এই তিনের মধ্যে সমন্বয়ে বেশকিছু সমস্যা বিদ্যমান। এ থেকে তথ্য প্রদানের আবেদন বা অনুরোধকে অযৌক্তিকভাবে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বা দ্বিধান্বিত আমলাদের জন্য সুযোগ তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, উপাত্ত সংরক্ষণ এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় তথ্যের গোপনীয়তা বিষয়ক আইনগুলো একইসাথে ‘জনগণের/সরকারি তথ্য প্রকাশের অধিকার’ এর সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে। তাই যখনই আইনের খসড়া তৈরি করা হয় তখনই এ বিষয়গুলো চিহ্নিত ও বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে তথ্য প্রকাশের ভালো ও মন্দ দিক এবং সরকারি ও বেসরকারি অধিকার-এর মধ্যে ভারসাম্য করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত এরপরও গোপনীয়তা রক্ষার আইনগুলোর দোহাই দিয়ে তথ্য প্রকাশের ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। এ প্রসঙ্গে দেখা যায়, গোপনীয়তা আইনের কারণে সরকার অযৌক্তিকভাবে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছে- এরকম বেশকিছু অভিযোগ নিউজিল্যান্ডের প্রাইভেসি কমিশনার গ্রহণ করেছিল।[১৭]

সাক্ষ্য আইনে জনস্বার্থ রক্ষাকারী ধারাসমূহও কখনো কখনো 'রাষ্ট্রের যেকোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অপ্রকাশিত দাপ্তরিক দলিলপত্র' সুরক্ষিত রাখে, এবং কর্মকর্তাদের 'তথ্য প্রকাশ করা বা না করা বা স্থগিত রাখা'র অনুমতি প্রদানে ব্যাপক স্বাধীনতা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তারা জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্য নাও থাকতে পারেন।[১৮] তবে সরকারের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক ও সঙ্গতিপূর্ণ মনোভাব নিশ্চিত করার জন্য 'তথ্য অধিকার আইন' প্রণীত হওয়ার পর এ ধরনের তথ্য গোপন করার ধারা সংশোধন নয়তো বাতিল করা উচিত।

তথ্য প্রকাশে সহায়ক আইন প্রণয়ন

প্রাথমিকভাবে তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য সরকারের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া। তবে এ আইন তথ্য প্রকাশের সবগুলো বিষয়কে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরে না। তাই সরকারের মধ্যে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো পৃথক পৃথক আইনের মাধ্যমে সুরাহা করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর যথার্থ গুরুত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ ব্যবস্থা সাফল্য বয়ে আনে। এর মাধ্যমে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ লক্ষ্যসমৃদ্ধ হয় এবং যেসব বিচ্ছিন্ন ও অসম বিধি পর্যাপ্ত গবেষণা ও মতামত গ্রহণ ছাড়াই সংসদে উপস্থাপিত হয় তা এড়ানো যায়।

কার্যকর উপ-ধারা

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, গোপনীয়তা রক্ষার মানসিকতার একজন আইন প্রণেতা তথ্য অধিকারের বিষয়টিকে সংকুচিত করতে পারে এবং প্রশাসনিক বাধা সৃষ্টি করার মতো নিয়ম-নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে, যা তথ্যের জন্য আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। আইনসভা একটি শক্তিশালী তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করার পরও সরকারি কর্মকর্তারা নতুন প্রবিধান তৈরি ও প্রশাসনিক বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে কার্যকরভাবে এ আইনের প্রভাব হ্রাস এবং পরিধি সংকুচিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে 'কোন উদ্দেশ্যে তথ্য চাওয়া হচ্ছে'- এ ধরনের প্রশ্ন ফরমের মধ্যে রাখা হয়েছে, যদিও এ ধরনের কোনো শর্ত মূল আইনে উল্লিখিত ছিল না। ব্যবহার-বান্ধব মূল আইনের সাথে অন্যান্য উপ-ধারাসমূহের যেন কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় তা নিশ্চিত করতে বাস্তবায়নকারী এবং পরিবীক্ষণকারী সংস্থাগুলোর সতর্ক থাকা উচিত।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকে নিরুৎসাহিত করতে আবেদনের জন্য অত্যধিক ফি আরোপের ব্যবস্থা সরকারি কর্মকর্তাদের অন্যতম একটি কৌশল। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের জাতীয় তথ্য প্রাপ্তি আইনে তথ্য চেয়ে আবেদনের জন্য একটি যৌক্তিক ফি নির্ধারণের বিষয়ে বলা হলেও কিছু কিছু রাজ্যে ৫০ রুপি পর্যন্ত ফি আরোপ করা হয়েছে, যা কিনা দেশের ৪০ শতাংশেরও বেশি মানুষের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ করার খরচের সমান। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ফি মাত্র ১০ রুপি। যদিও আইন অনুযায়ী দেওয়ার অনুমোদন নেই, তথাপি কিছু কিছু রাজ্য আপিল দাখিলের জন্য ফি আরোপ করেছে। এটি অনিচ্ছাকৃত ভুল নয়, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পেছন থেকে ছুরি মেরে তথ্য প্রাপ্তি অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করা।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারকারীদের নিরাপত্তা

একটি কার্যকর স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশ আইন দ্বারাও সহায়তা পেয়ে থাকে। সম্পূরক এই আইন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'মুখ খোলা' কর্মীকে নিরাপত্তা দেয়। সৎ কর্মকর্তারা চাকরির শর্ত অথবা গোপনীয়তার নীতিমালা দ্বারা বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। আইনি সুরক্ষা অথবা স্পষ্ট নির্দেশনা ছাড়া অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে গিয়ে এসব কর্মকর্তা প্রায়ই তথ্য প্রকাশ করতে হয় আইনগতভাবে অপারগ হন, নয়তো ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন।

মন্ত্রীর দেওয়া সনদের নেতিবাচক প্রভাবহ্রাস

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে কিছু তথ্য অধিকার আইন 'মন্ত্রীর সনদ' ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকে, যার মাধ্যমে কোনো নথি বা দলিল গোপনীয় কিনা মন্ত্রী তা প্রত্যয়ন করে থাকেন। সাধারণত এ ধরনের সনদকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় না, এমনকি কোনো স্বাধীন আপিল কর্তৃপক্ষ বা আদালতও তা করতে পারে না। এসব সনদের ব্যবহার তথ্য অধিকারের যেসব ভালো উদ্যোগ প্রচলিত আছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পুরনো ধারার প্রতিফলন। অস্ট্রেলিয়াতে ২০ বছরের বেশি পুরনো আইনে এ ধরনের সনদের ব্যবহার দেখা যায়। তথাপি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের সনদের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিধায় সংসদ সদস্য এবং নাগরিক সমাজ প্রায়ই এর ব্যবহার নিয়ে সমালোচনা করেন। কারণ এ ধরনের সনদ মন্ত্রীদের দায়বদ্ধ না থাকার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ১৯৯৪ সালে অ্যাটর্নি জেনারেলের বিভাগের কর্মকর্তারা এ সনদের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন:

''তথ্য অধিকার আইনের মুক্ত জগতে সিদ্ধান্তমূলক সনদের ব্যবস্থা কালের বিচারে বেমানান এবং বাস্তবতার আলোকে অপ্রয়োজনীয়। এটি প্রমাণিত যে, আইনের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যতিক্রম ধারাসমূহ সত্যিকারের সংবেদনশীল দলিলপত্রের অব্যাহতির জন্য যথেষ্ট।''[১৯]

সরকারকে আরও স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ করতে বিশেষভাবে প্রণীত আইনে মন্ত্রী কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদের ব্যবহার সমর্থন করা যায় না। যেসব আইন এ ধরনের সনদ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকে সনদ ব্যবহারের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য কিছু কঠোর নিয়ম-কানুন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অধিকন্তু এসব সনদের অপব্যবহার প্রতিরোধে এগুলো শুধুমাত্র কেবিনেট মন্ত্রী অথবা অ্যাটর্নি জেনারেল কর্তৃক ইস্যু হওয়া উচিত। যুক্তরাজ্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সেখানে মন্ত্রী কর্তৃক এ ধরনের যে কোনো সনদ ইস্যু করার পর তা যথাযথ ব্যাখ্যাসহ অবশ্যই আইনসভায় উত্থাপন করতে হয়।

জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশের আইনগুলো 'হুঁশিয়ারকারীর নিরাপত্তা' আইন নামেও পরিচিত। এ আইন দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের অনিয়ম সম্পর্কে তথ্য প্রকাশে উৎসাহিত করে এবং পরবর্তীতে প্রতিশোধমূলক নিপীড়ন থেকে সৎ কর্মকর্তাদের রক্ষা করে থাকে। দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার বলতে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা সৃষ্টি, জনগণের আস্থা রক্ষা এবং দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাকে বোঝায়। অস্ট্রেলিয়ায় জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশের কোনো প্রাদেশিক আইন নেই। কিন্তু এর বেশিরভাগ প্রদেশে অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর তথ্য প্রকাশকারী সরকারি ব্যক্তি ছাড়াও সাধারণভাবে যে কারও নিরাপত্তা বিধান করে এমন আইন রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা তথ্য প্রাপ্তি আইনের পাশাপাশি 'হুইসেল ব্লোয়ার' আইনও প্রণয়ন করেছে।[২০] যুক্তরাজ্য তথ্য প্রাপ্তি আইনের আগেই এই আইন প্রণয়ন করে, যখন কতগুলো তদন্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে তথ্য প্রকাশের সুযোগ থাকলে অনেক সংস্থায় প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেয়ার মাধ্যমে বিপর্যয় এড়ানো যেত।[২১] উদাহরণস্বরূপ, ব্যাংক অব ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, ব্যাংকের কর্মচারীদের মধ্যে ভয়-ভীতি এমনভাবে কাজ করছিল যা তাদেরকে ব্যাংকে সংঘটিত দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দেয়নি। অনুরূপভাবে, যুক্তরাজ্যের ক্লেফ্যাম রেল দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ারিং ব্যবস্থার কারণে এ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জেনেও নিরাপত্তাহীনতার জন্য কর্মীরা এ ব্যাপারে কথা বলেনি।[২২]

উন্মুক্ত সভা

স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, তথ্যভিত্তিক অংশগ্রহণে উৎসাহ দান এবং আস্থা বৃদ্ধি করার জন্য প্রগতিশীল সরকারগুলো কিছু আইন বাস্তবায়ন করছে, যেখানে জন প্রতিষ্ঠানের জন্য সকলের সাথে অংশগ্রহণ এবং সকলের সাথে পরামর্শ করার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এ ধরনের ব্যবস্থাকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে তা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩] ২১ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিউজিল্যান্ডে তথাকথিত 'সানশাইন ল' প্রচলিত রয়েছে।[২৪] বেশিরভাগ সানশাইন আইনের আওতায় শুধুমাত্র প্রথাগত

পদ্ধতিতে ডাকা সভা অন্তর্ভুক্ত। ছোট-খাটো আন্তঃবিভাগীয় সভা এ আইনের আওতাভুক্ত নয়, কারণ এ ধরনের সকল সভার ব্যাপারে জনগণকে আগে থেকে জানানো বাস্তবতার নিরিখে অসম্ভব এবং এটি সরকারি কার্যক্রমকে মন্থর করে ফেলতে পারে। জন-প্রতিষ্ঠান বলতে দুই বা ততোধিক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান যা সরাসরি জনগণের সাথে ও জনস্বার্থে কাজ করে, যেমন সিটি কাউন্সিল, টাউন বোর্ড, স্কুল বোর্ড, কমিশন এবং আইনি সংগঠন ও এর উপ-কমিটিসমূহকে বোঝায়।

সভার কার্যক্রমের সব অংশ সবার জন্য উন্মুক্ত নাও হতে পারে, কারণ কিছু আলোচনা হয়তো সত্যিকার অর্থেই কোনো সংবেদনশীল তথ্য অথবা সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত। এ কারণে অধিকাংশ সানশাইন আইনে রুদ্ধদ্বার বৈঠক বা 'নির্বাহী' সভার বিধান রয়েছে। তবে অপব্যবহার রোধে এ ধরনের সভা ও অধিবেশনের ক্ষেত্রে কিছু কঠোর নিয়ম-কানুন আরোপ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সভার মুক্ত অংশে একটি প্রস্তাবনা উথাপন করা হবে যা নির্বাহী সভার অধিবেশন শুরুর প্রস্তাব করবে। এ প্রস্তাবনা অবশ্যই বিবেচ্য বিষয় অথবা বিষয়সমূহের সাধারণ ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করবে; এবং তারপর এটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাশ হতে হবে। এছাড়াও একটি সরকারি সংস্থা যে বিষয়ই গ্রহণ করুক না কেন, জনসাধারণের জন্য তা নিয়ে আলোচনার পথ রুদ্ধ করে রাখতে পারবে না। বরং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী কোন কোন বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা অবশ্যই নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠকে জাতীয় রাজস্ব বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এর বিস্তারিত কার্যবিবরণী প্রকাশ করা এবং তা জনগণের জন্য সহজলভ্য করা উচিত। আইনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা গুরুত্বপূর্ণ। কার্যবিবরণীতে ভোট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকা দরকার, যেন একজন সদস্য কীভাবে প্রতিটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভোট দেয় তা বোঝা যায়। যখন কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান কোনো সভা করে অথবা নির্বাহী অধিবেশনে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন এর কার্যবিবরণী অবশ্যই প্রকাশ করা উচিত। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের বিষয়ে যে কারও অভিযোগ দাখিল করতে পারার বিধি আইনে থাকা উচিত। পাশাপাশি 'উপযুক্ত কারণ' দেখিয়ে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত অকার্যকর বা বাতিল করার ক্ষমতা আদালতের থাকা উচিত।

স্থানীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু চকরিয়ার কোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় অবস্থিত কোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ। প্রায় ২১ হাজার মানুষ অধ্যুষিত এ ইউনিয়নের অধিকাংশ জনগণ নিরক্ষর। কৃষিকাজ, মৎস্য আহরণ ও দিন মজুরি এই ইউনিয়নের মানুষের উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিকে বাদ দিলে ইউনিয়নের বেশিরভাগ মানুষই অত্যন্ত দরিদ্র।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), চকরিয়া 'তথ্যই শক্তি' শ্লোগানকে ধারন করে ২০০৫ সালের ডিসেম্বর থেকে তথ্য প্রকাশের নানা উদ্যোগ এবং কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। মতবিনিময় সভা, কর্মশালা, সেমিনার, মা সমাবেশ, জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান, উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা, তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক কার্যক্রম প্রভৃতির মাধ্যমে সনাক চকরিয়া কোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অধিকার বিষয়ে সচেতনতাবোধ তৈরি ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ ইউনিয়নে বর্তমানে জনগণ তথ্য জানার ফলে স্বেচ্ছায় কর দিচ্ছে, স্থানীয় জনগণ ও পরিষদ সদস্যরা যৌথভাবে শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়মিত স্কুলগুলো পরিদর্শন করছে, বন্ধ হচ্ছে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও নারী নির্যাতনের মত সামাজিক অপরাধ, সুনিশ্চিত করা হচ্ছে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা সেবা, নাগরিকদের সামনে ঘোষিত হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট এবং সর্বোপরি মানুষের সামনে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের। সনাকের অনুঘটকের ভূমিকায় কোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ এখন পরিণত হয়েছে স্থানীয় মানুষের উন্নয়ন প্রচেষ্টার একান্ত সহযোগীতে।

কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

সব ধরনের সরকারি প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তারা একই ধারা অনুসরণ করে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। নতুন নতুন তথ্য প্রযুক্তি সৃজনশীল কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে এটাও ঠিক যে প্রকাশিত যে কোনো ধরনের দলিল, নথি ও প্রকাশনার গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়। আইন বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মনোযোগ সহকারে উপকরণ, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, টুল তৈরি করার জন্য কাজ করে কিনা তা নিশ্চিত করা। আর এটি করতে পারলেই সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আইনটি বাস্তবায়ন অনেক সহজ হবে এবং তাদের সময় ও পরিশ্রম কমবে। ফলে এ প্রক্রিয়া আইনের বিভিন্ন ধারার বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক বাধা কমাতে সাহায্য করবে। বাস্তবিক অর্থে একটি কার্যকর ব্যবস্থা আইনটি প্রয়োগে সময় ও সম্পদের ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে পরিচালনা করবে।

কর্মকর্তাদের জন্য সহায়িকা উপকরণ তৈরি

কর্মকর্তারা তথ্য প্রাপ্তির আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নয়। আর তাই এটি কখনো কখনো তাদের জন্য সত্যিকার অর্থেই ভীতির কারণ হতে পারে। এ আইন বাস্তবায়নের শুরুতেই যখন তারা দেখবে প্রতিদিনের কাজে এর প্রভাব কতখানি তখনই এই ভীতির সঞ্চার হবে। একটি নতুন তথ্য অধিকার আইনের ক্ষেত্রে এর বিভিন্ন বিধি সম্পর্কে সকল কর্মকর্তার একটি মৌলিক ধারণা থাকা দরকার। তারা যখন তথ্য সরবরাহের কাজ করবে তখন সেটি কীভাবে করবে তা যেন বুঝতে পারে। বিশেষ করে যখন তথ্য সংক্রান্ত কোনো

টেমপ্লেট তৈরি: ভারতে নিজ উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব বাস্তবায়ন

অনেক নতুন তথ্য অধিকার আইন নিজ উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের জন্য ব্যাপক দায়িত্ব নির্দেশ করে। সেক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে নিয়মিতভাবে নথি ও দলিল প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে তথ্য অধিকার কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান এসব নতুন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনীহা দেখাতে পারে। সাধারণত তথ্য সংগ্রহ এবং একত্রীকরণের কাজ তাদের জন্য অনেকটাই বাড়তি ঝামেলার হতে পারে- এটা ভেবেই তারা একে সহজ ভাবে নেয় না। তবে ইতিবাচকভাবে দেখলে এটা তাদের জন্য একটা সুযোগ। স্বেচ্ছায় তথ্য প্রকাশের জন্য তাদের কাছে কী ধরনের তথ্য আছে তা পরিমাপ করার সুযোগ, কীভাবে একে সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা যায় এবং নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে জনগণের সামনে কতটা উপযোগী করে প্রকাশ করা যায় তা জানার সুযোগ। এ আইনের অধীনে যে তথ্যগুলো প্রকাশ করতে হবে তা কীভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সংগ্রহ ও একত্রিত করা যায় তা নির্ধারণে সংস্থাগুলোকে সাহায্য করতে আইনটি বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল প্রতিষ্ঠানের তৈরির নির্দেশনা অথবা টেমপ্লেট সহায়ক হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতের একটি রাজ্য সরকার বাইরের একজন পরামর্শককে দিয়ে এ কাজটি করিয়েছিল। এ কাজে 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ'এ সহায়তা করতে একটি বিস্তারিত টেমপ্লেট তৈরি করা হয়, যাতে কর্মকর্তাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো চিহ্নিত করার বিভিন্ন উপায় বর্ণিত ছিল: (ক) নির্দিষ্ট কী কী তথ্য সংগ্রহ করা দরকার; (খ) কে তথ্য সংগ্রহ করবে; (গ) কতদিন অন্তর তথ্য সংগ্রহ করবে; (ঘ) কোথা থেকে অথবা কার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে; এবং (ঙ) কীভাবে সর্বোত্তম উপায়ে তথ্য বিতরণ করবে। সরকারের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছিল। খুব কার্যকর মনে হওয়ায় সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছে এটিকে পাঠানো হয়েছিল। টেমপ্লেট তৈরি করার মাধ্যমে একই পদ্ধতি বিভিন্ন বিভাগ আলাদাভাবে উদ্ভাবন করলে যে সময় ও প্রচেষ্টার অপচয় হতো তা রোধ করা গেছে। সরকার এও নিশ্চিত করেছিল যে, সকল সংস্থা একই ধারায় এবং সঙ্গতি বজায় রেখে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

আবেদনপত্র তাদের কাছে আসে, সেটি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা যেন বুঝতে পারে। এছাড়া আইনটি সম্পর্কে সকল তথ্য কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের বিস্তারিতভাবে জানা থাকা দরকার, যাতে তারা তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন সঠিকভাবে যাচাই এবং নির্ভুলভাবে অব্যাহতির ধারা প্রয়োগ করতে পারে এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগত দিকগুলোও অনুসরণ করতে পারে। প্রশিক্ষণ নতুন আইনের সাথে পরিচিত করায়। অন্যান্য ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা বলে প্রশিক্ষণের সাথে সহজ সহায়িকা প্রণয়ন খুবই কার্যকরি। অজানা/ অপ্রত্যাশিত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তখন কর্মকর্তাগণ এই সহায়িকাকে রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

জ্যামাইকার তথ্য প্রাপ্তি ইউনিট বিভিন্ন পর্যায় নির্দেশ করে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশনা প্রদানমূলক একটি ম্যানুয়াল তৈরি করে যা সরকারের সকল সংস্থা এবং স্টেকহোল্ডারের কাছে পাঠানো হয়। একই সাথে এর ইলেকট্রনিক অনুলিপি ইউনিটের ওয়েবসাইটেও তুলে দেওয়া হয়।[২৫] ম্যানুয়ালটিতে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া আছে কীভাবে তথ্য সংক্রান্ত আবেদন ও আপিল করতে হবে। বেশকিছু বিষয়ে সেখানে স্পষ্ট নির্দেশনা আছে, যেমন কীভাবে সময়সীমা হিসাব করতে হবে, কীভাবে তৃতীয় পক্ষের সাথে লেনদেন করতে হবে, রশিদ সরবরাহ করতে হবে, কোথায় কত ফি ধার্য করতে হবে এবং অব্যাহতি প্রয়োগ করতে কী পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে ইত্যাদি। তথ্য প্রাপ্তি ইউনিটটি একটি রোডম্যাপও তৈরি করে। এটি ছিল মূলত বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং তাদের কার্যক্রম, প্রধান কর্মকর্তা ও তার অফিসের অবস্থান ও যোগাযোগের ঠিকানার তথ্য সংবলিত একটি তালিকা। রোডম্যাপটি সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়। আশা করা হয় যে এ রোডম্যাপ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যৌথভাবে প্রক্রিয়াজাত করা এবং প্রয়োজনে এক সংস্থা থেকে অন্য সংস্থায় স্থানান্তর সহজ করবে।

যুক্তরাজ্যের 'তথ্য স্বাধীনতা আইন ২০০০' প্রণীত হওয়ার আগেই সে দেশের তথ্য কমিশনার সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ তৈরির জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করেন। উপকরণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী হচ্ছে তথ্য কমিশনারের নির্দেশনা সিরিজ। এ সিরিজে কমিশনার কীভাবে বাস্তব জীবনে অব্যাহতির ধারা প্রয়োগ করতে হবে তার উদাহরণসহ প্রত্যেকটি অব্যাহতি ধারার ওপর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২৬] কিছু জটিল প্রক্রিয়াগত বিষয় যেমন তথ্য সংক্রান্ত আবেদন স্থানান্তর এবং আপিল সংক্রান্ত কাজের ওপরও নির্দেশনা তৈরি করা হয়। নতুন আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাঝখানে অন্যান্য বিষয়ে যেমন নথি ব্যবস্থাপনা পরিচালনা বিধিও প্রণীত হয়।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য জানার অধিকার লাভ

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা নিবাসী সুবাস কুমার বাঁসফোর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরে কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পের বেশকিছু বিষয় জানতে চান। এ দুটি প্রকল্পের আওতায় কোন এলাকায় কত কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে তার পরিমাণ এবং সুবিধাভোগীদের তালিকার জন্য একটি আবেদন করেন। একইসাথে আরেকটি আবেদনপত্রে একই উপজেলায় মোট ভূমি ও খাস জমির পরিমাণ এবং খাসজমি বন্দোবস্ত পাওয়ার নিয়মাবলী সংক্রান্ত সরকারি প্রজ্ঞাপনের কপিসহ উপজেলা ভূমি অফিসের সাপ্তাহিক সময়সূচি সংক্রান্ত তথ্য জানতে চান। এই প্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পরের দিন আবেদনের বিষয়ে জানতে চান। তিনি এ সংক্রান্ত তথ্য দিতে হলে ৩০/৪০ বছর আগের ফাইল বের করতে হবে বলে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি ভূমি অফিসে লিখিতভাবে জানতে চাওয়ার কারণে পুলিশ দিয়ে তল্লাশি করানোর কথা বলেন। বিষয়টি রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ (আরআইবি)-কে জানালে তারা সুবাস কুমার বাঁসফোরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। আরআইবি-এর কর্মকর্তা পরদিন তার সাথে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে যান। তখন উপজেলা কর্মকর্তা তিনদিনের মধ্যে কুরিয়ার করে তথ্য পাঠানোর কথা বলেন। পরবর্তীতে সুবাস কুমার লিখিত আবেদনের সব তথ্যই পান।

তথ্যসূত্র: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ (আরআইবি), বাংলাদেশ

আইন মেনে চলার জন্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

তথ্য অধিকার আইনের চাহিদা পূরণের জন্য কর্মকর্তাদের সাহায্য করতে নির্দেশিকা তৈরি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি সকল সংস্থা এ আইন মেনে চলছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থা বিশদভাবে বিবেচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সরকার সকল কর্মকর্তার জন্য নির্দেশনা এসব সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সরকারি ওয়েবসাইট এমনকি অভ্যন্তরীণ বিভাগীয় ওয়েবসাইট বা ইন্ট্রানেট ব্যবহার করে থাকে। কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আইন বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য এসব সরকার ডেটাবেজ ও অন্যান্য তথ্য ব্যবস্থাও ব্যবহার করেছে, যাতে বিভাগীয় উদ্যোগ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে সফল উদ্যোগ অনুকরণ করা যায় এবং 'উন্নয়ন প্রয়োজন' ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে তা নিয়ে কাজ করা যায়। এই তথ্য জনগণের জন্যও প্রয়োজনীয় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কানাডার কেন্দ্রীয় সরকার সকল সরকারি সংস্থায় জমা দেওয়া আবেদনগুলোর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে তা একটি একক নথিতে সংকলিত করে। এসব তথ্য নিয়মিত অনলাইনে প্রকাশিত হয় যা জনগণ নিজ নিজ আবেদন পূরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে, সংসদ সদস্যরা সম্ভাব্য দায়বদ্ধতার বিষয়ে তদন্ত কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারে, এমনকি গণমাধ্যমও জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরার জন্য ব্যবহার করতে পারে।[২৭]

তথ্যনির্ভর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে 'নজির' সংগ্রহ এবং একত্রীকরণের জন্য ব্যবস্থা তৈরি করা জরুরি যাতে কর্মকর্তারা তথ্য কমিশনারসহ আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাখ্যা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। যত বেশি আবেদন প্রক্রিয়া করা হবে এবং আপিল শুনানি হবে আইনের ব্যাখ্যা ততই পরিমার্জিত হবে। কানাডার 'তথ্য অধিকার আইন ১৯৮২' এর অনলাইন সংস্করণে আদালতের রায়সহ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দলিলের লিংক উল্লেখ করা আছে। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড প্রদেশে তথ্য কমিশনারের সব সিদ্ধান্ত কমিশনের ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হয় এবং এগুলো অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বর্ণানুক্রমিকভাবে, তারিখ ও শিরোনাম অনুযায়ী সাজানো (পরিশিষ্ট ৪ দেখুন)। বিস্তারিত রায়ের পাশাপাশি, এমনকি চিঠির মাধ্যমে প্রদত্ত সাধারণ সিদ্ধান্তও ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয়।[২৮] স্কটল্যান্ডের তথ্য কমিশনারও সমস্ত সিদ্ধান্তের নোটিশ তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেন।[২৯]

নথি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

তথ্য অধিকারের মূল ভিত্তি হচ্ছে নথি বা দলিল অর্থাৎ কাগজপত্র, দলিল, ফাইল, নথি, নোট, প্রকাশনা উপকরণ, ভিডিও চিত্র, অডিও টেপ, নমুনা কপি, কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট, ডিস্ক এবং তথ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রী। দলিল একইসাথে সরকার এবং জনগণের সম্পদ। এসব দলিলে এমন সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে যা জনগণকে সরকারি কার্যক্রম 'কীভাবে' পরিচালিত হয়েছে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত 'কেন' গ্রহণ করা হয়েছে তা বুঝতে সাহায্য করে। এগুলো হচ্ছে সেই মাধ্যম যা দিয়ে সরকার পিতা-মাতা কর্তৃক তার সন্তানের পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণের প্রক্রিয়ার ভিত্তি থেকে শুরু করে সংসদ কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধান, প্রধান হিসাব নিরীক্ষক বা ন্যায়পাল কর্তৃক বিশাল অঙ্কের রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা চুক্তির তদন্ত সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জনগণকে দিতে পারবে। নির্ভুল দলিল নির্ভুল উত্তর প্রদানে সক্ষম।

নথি তৈরি, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের একটি কার্যকর ব্যবস্থা ছাড়া একটি তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন অনেক দুরূহ। যথাসময়ে কোনো অনুরোধকৃত তথ্য খুঁজে পাওয়া না গেলে সময়মতো আবেদনের উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। অদক্ষভাবে তথ্য সংরক্ষণের কারণে যদি দলিল পরীক্ষা করা বা অনুলিপি তৈরি করার উপযোগী না থাকে, তবে তা এ আইনকে হেয় করবে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা, অপর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও নথি ব্যবস্থা, দুর্বল শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি- এসবই হচ্ছে প্রধান সমস্যা যা সরকারের কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত লক্ষ্য অর্জনে তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য একটি চলমান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। এতে বিভিন্ন সংস্থা আইনটির প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা সঠিকভাবে পালন করছে কিনা তা সরকারি সংস্থা, আইন বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থার প্রধান এবং তথ্য কমিশন নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করতে পারবে। এটি করার মাধ্যমে তারা যেসব সরকারি সংস্থার আরও প্রশিক্ষণ ও পদ্ধতিগত সহায়তার প্রয়োজন আছে তা নিরূপণ করতে পারবেন, যেমন কোন প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে যথাসময়ে আবেদন বা আপিল নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এভাবে সময়ের সাথে সাথে আবেদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে এবং আইন বাস্তবায়নের ব্যয় কমাতে এই প্রক্রিয়া সহায়তা করবে।

আইন মেনে চলা অর্থবহভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য সংগ্রহে সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানে যথাযথ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা অবিলম্বে শুরু করা অত্যন্ত জরুরি। যুক্তরাজ্য একটি সহজ কম্পিউটারভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার প্রণয়ন করেছে যেখানে মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস ডেটাবেজ ব্যবহৃত হয়। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক কর্মকর্তা তার দায়িত্বে থাকা প্রতিটি আবেদন বা আপিল সম্পর্কিত তথ্য ডেটাবেজে সংযোজন করতে পারে।[৩০] এ ডেটাবেজ আবেদনকারীর ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে, যা কর্মকর্তাদেরকে যথাযথ সময়সীমা মানা হচ্ছে কিনা তা লক্ষ রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এটি এমনকি 'টিক চিহ্ন প্রশ্নাবলী' ব্যবহার করে জনগুরুত্বসম্পন্ন তথ্য বা অব্যাহতির বিষয় যাচাই করতে পারে। এই ডেটাবেজটি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায় এবং এতে পরিমার্জনের সুযোগ রয়েছে।

অনেক দেশে কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা নেই এমন জায়গার অনেক কর্মকর্তাকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াকরণের কাজ করতে হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কিছুটা কাগজভিত্তিক অথবা কিছুটা ইলেকট্রনিকভিত্তিক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা উপযুক্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নস্তরের কর্মকর্তারা কাগুজে পরিসংখ্যান তৈরি করতে পারে, যা জেলা পর্যায়ে সংকলিত ও কম্পিউটারভুক্ত হবে এবং এটি পরবর্তীতে আরও বিস্তৃত বিভাগীয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থায় যুক্ত হবে। তথ্য কমিশন বা আইন বাস্তবায়নকারী মূল সংস্থা এতে সহজেই এ ডেটাবেজ পরীক্ষা করে বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবে। তারা মাসিক ভিত্তিতে তাদের ওয়েবসাইটে পরিসংখ্যান প্রকাশ করতেও সক্ষম হবে।

সরকারের অবশ্যই একটি যথাযথ পদ্ধতি থাকতে হবে যা ব্যবহার করে নির্ভরযোগ্য দলিল তৈরি এবং সংরক্ষণ করা যায়। তা না হলে এমনকি সবচেয়ে বেশি শুভবোধসম্পন্ন কর্মকর্তারাও তাদের কাজের পরিবেশের দরুণ তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অপারগ হতে পারেন। আরও সমস্যার ব্যাপার হচ্ছে যে, যথাযথ পদ্ধতি না থাকলে দলিল ভুলভাবে ব্যবহার, মুছে ফেলা বা ধ্বংস করা সম্ভব, এবং জনগণ এসব দলিলের শুদ্ধতা সম্পর্কে কখনোই নিশ্চিত হতে পারবে না। দলিলের অপব্যবহার মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির মতই বিচিত্র হতে পারে। তবে সূক্ষ্ম ও উন্নত প্রযুক্তি দিন দিন যাচাই প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলছে। ভারতে একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে পদত্যাগ করতে হয় যখন ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে তিনি তাঁর অপরাধ ঢাকার জন্য ফাইল নোট পরিবর্তন করে পেছনের তারিখ দিয়েছেন।[৩১]

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান আছে যে, দলিল ব্যবস্থাপনা এমন হতে হবে যাতে তথ্য সংগ্রহ সহজ হয়। উপরন্তু, দলিলসমূহ কম্পিউটারে সংরক্ষিত ও নেটওয়ার্কে সংযুক্ত থাকতে হবে।[৩২] যদিও এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তবুও, অন্ততপক্ষে বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারের শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নিরিখেই নয়, বরং শ্রেণীবিন্যাসকরণ ও আর্কাইভের বর্তমান দলিল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পর্যালোচনা করা দরকার। সফল উদ্যোগের জন্য প্রয়োজন এমনভাবে দলিল তৈরি ও ব্যবস্থাপনা করা যা হবে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দক্ষ নথি ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত স্পষ্ট, সহজবোধ্য, সুবিন্যাসকৃত ও সহজে পুনরুদ্ধারযোগ্য পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নতুন প্রযুক্তির নিরন্তর উদ্ভাবনের কারণে তথ্য ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকায় ইলেকট্রনিক তথ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারেও যথাযথ নির্দেশনা থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

ইলেকট্রনিক নথি সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ

নতুন প্রযুক্তি সুচারুভাবে তথ্য সংরক্ষণ এবং পূর্বের চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে চাহিদানুযায়ী সহজলভ্য করার সুযোগ তৈরি করেছে। কিন্তু আবার ইলেকট্রনিক তথ্য সৃষ্টি ও সংরক্ষণ জটিল চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দিয়েছে। কাগুজে পদ্ধতির বস্তুগত অস্তিত্ব আছে এবং এটি সহজে কেন্দ্রীভূত করা যায়। অন্যদিকে ভারচুয়াল ও ই-মেইলভিত্তিক দাপ্তরিক যোগাযোগ দিন দিন বেড়েই চলেছে। যোগাযোগ দ্রুত হচ্ছে কিন্তু নথি তৈরি হচ্ছে বেশি এবং সাধারণভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সংরক্ষণ ব্যবস্থায় রক্ষিত হচ্ছে। যদি আধুনিক তথ্য সন্নিবেশ ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা চালু না থাকে তাহলে ধারাবাহিকতা, মতামত এবং সিদ্ধান্তের বিস্তারিত বর্ণনা সহজেই বিকৃত হতে পারে।

যদি ইলেকট্রনিক ও কাগুজে তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সতর্কতার সাথে ব্যবস্থাপনা না করলে প্রাতিষ্ঠানিক ডেটাবেজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জনগণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধ থাকার সক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। আদালতে ইলেকট্রনিক তথ্য দিন দিন গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। তাই বলা যায় দলিলসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদ্ধতি যদি না থাকে তবে সুবিচার ব্যাহত হবে।

তুলনামূলকভাবে দরিদ্র দেশগুলোতে যথাযথ তথ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা খুব কমই অগ্রাধিকার পায় এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, এর অর্থায়নের নিশ্চয়তা কম। যন্ত্রপাতি, স্থান, লোকবল এবং কারিগরি জ্ঞানের অভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। অনেক সরকারই আশঙ্কা করে যে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতি তাদের সামর্থ্যের বাইরে। যেহেতু এটি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় তাই যন্ত্রপাতি স্থাপন করা তাদের কাছে ব্যয়বহুল মনে হয়। তবে সময়ের সাথে সাথে যন্ত্রপাতির দাম কমে আসছে এবং দরিদ্র দেশগুলো যাতে সুলভে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা পেতে পারে সেই লক্ষ্যে বর্তমানে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। যাই হোক, তথ্য যদি ডিজিটাল রূপ না পায়, তবে তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের কারণে কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক তথ্য সন্নিবেশ ও পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাও অচল হয়ে যাবে।

অনেক দেশেরই জাতীয় আর্কাইভ যে আইনের অধীনে পরিচালিত হয় সে আইনে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতি ভাল নথি ব্যবস্থাপনার জন্য অপ্রতুল। এর কারণ আর্কাইভস্থ করার ক্ষেত্রে প্রধান অগ্রাধিকার হচ্ছে ঐতিহাসিক দলিল সংরক্ষণ। অন্যদিকে সক্রিয় নথি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য ভিন্ন। সেখানে একটি দলিলের পূর্ণ সময়কালে তা নিয়মমাফিক সংরক্ষণ এবং সময় শেষে তা নিয়মমাফিক ধ্বংস করা হয়। নতুন আইনের ধারা, তা তথ্য প্রাপ্তি আইন হোক বা ভিন্ন আইন হোক, বিভিন্ন ধরনের নথি ব্যবস্থাপনার জন্য (কাগজভিত্তিক বা ইলেকট্রনিক) একটি একক পদ্ধতি বা প্রণালী নিশ্চিত করতে পারলে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়।

> যে কোনো তথ্য অধিকার আইনের মান নির্ভর করে, যে মানের নথি/দলিলের প্রাপ্তি এই আইন দ্বারা নির্ধারিত হয় তার ওপর। এ ধরনের অধিকার একেবারে গুরুত্বহীন যদি প্রথমেই নির্ভরযোগ্য দলিল তৈরি না হয় বা প্রয়োজনের সময় পাওয়া না যায়, অথবা সংরক্ষণের ও ধ্বংসের যথাযথ ব্যবস্থা অপ্রতুল হয়। *-খসড়া আকারে প্রণীত যুক্তরাজ্যের নথি ব্যবস্থাপনার অনুশীলনবিধি।*[৩৩]

তথ্য সরবরাহের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

আধুনিক বিশ্বে যে পরিমাণ তথ্য তৈরি হয় সেই তথ্যের সরবরাহ (এমনকি যেখানে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে সেখানেও) শিক্ষার নিম্ন হার, ভাষার বৈচিত্র্য এবং দুর্গম অঞ্চলে বসতির কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। বিশেষত তুলনামূলকভাবে দরিদ্র দেশগুলোতে বেশিরভাগ জনগোষ্ঠির কাছে তথ্য পৌঁছানো নিশ্চিত করা দুরূহ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি সবসময়ই লিখিত থাকে। কিন্তু যোগাযোগের এ মাধ্যমটি নিরক্ষর জনগোষ্ঠির জন্য দুর্বোধ্য এবং তাদর কাছে মৌখিক যোগাযোগই হচ্ছে তথ্যের প্রধান উৎস। তথ্য অবশ্যই সহজবোধ্য হতে হবে। যে জনগোষ্ঠির মধ্যে ভাষার বৈচিত্র্য রয়েছে এটি অবশ্যই তাদের জন্যও সহজবোধ্য করে তৈরি করতে হবে।

বিভিন্ন দেশ দূরত্ব এবং নিরক্ষরতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিয়মিতভাবে গ্রামীণ এলাকাগুলোতে কমিউনিটি পর্যায়ে সভা আহ্বান; স্থানীয় পরিষদ, বিদ্যালয়, ডাকঘর ও কমিউনিটি সেন্টারে দেওয়াল পত্রিকার ব্যবহারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রচার; গ্রামে ঢোল বাজিয়ে জনগণকে তাদের স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে সরকারি ঘোষণা দেওয়া; ভ্যানে মাইক বাজিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ; এমনকি ধোঁয়ার সংকেতের মাধ্যমে জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছে।

তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অবশ্যই এককভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখে। নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য তথ্য সম্প্রচার সরকার এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করে। তবে কিছু দেশে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি, উচ্চ পর্যায়ের সংযোগের সহজলভ্যতা এবং গণমাধ্যমের ব্যাপক আওতা সাধারণত সুসন্নিবেশিত তথ্য নিয়মিতভাবে বেশিরভাগ জনগোষ্ঠির কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করে। বেশিরভাগ দেশে সংবাদমাধ্যমের একটি বড় অংশ সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা সংবাদমাধ্যমের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে জনগণের কাছে সময়মতো প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠানোর ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, জ্যামাইকার সরাসরি সম্প্রচারিত রেডিও অনুষ্ঠানগুলো জনগণকে তদারকি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করেছে।[৩৪] দক্ষিণ আফ্রিকায় কমিউনিটি রেডিও ব্যাপক পরিমাণ তথ্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিচ্ছে।

যেসব দেশে নতুন তথ্য অবকাঠামো তৈরির জন্য যথেষ্ট অর্থ নেই সেখানে বিদ্যমান রেডিও ব্যবস্থা সরকারি তথ্য সম্প্রচারের জন্য একটি ব্যয়সাশ্রয়ী কিন্তু কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক দেশে বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে যেখানে বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যেকার দূরত্ব উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে বাধা হয়েছে, সেখানে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্যভাবে বার্তা পাঠানোর জন্য রেডিও কাজ করে চলেছে। সুতরাং রেডিও নেটওয়ার্ক তৈরি এবং চালু রাখার জন্য সরকারি বিভাগগুলো প্রায়ই বড় মাপের বিনিয়োগ করেছে। এসব নেটওয়ার্ক আরও সুশৃঙ্খলভাবে তথ্য প্রকাশে ব্যবহার করা যায়।[৩৫] যেমন, আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো সদর দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের জন্য স্বল্প ব্যস্ততার সময়ে সাধারণ সরকারি তথ্য সম্প্রচারে বেতার ব্যবহার করতে পারে। এমনকি স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলোকে 'তথ্য কেন্দ্র' হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কেননা এ ক্লিনিকগুলো প্রায়ই গ্রামে মিলনকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এখানে মা-বাবারা একত্রিত হয়ে তথ্য আদান-প্রদান করেন। একইভাবে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোও তথ্য কেন্দ্র হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে পারে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে অথবা যেখান থেকে ছাত্রদের মাধ্যমে একই তথ্য তাদের পিতা-মাতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে বহির্বিভাগে টিআইবি ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রয়াসে 'ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক' কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। 'তথ্য পাওয়ার অধিকার, সুশাসনের অঙ্গীকার'- এই চেতনা নিয়ে হাসপাতালের বহির্বিভাগে কী ধরনের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা সৃষ্টি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিশ্চিত করার সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে হাসপাতালে আসা দরিদ্র ও অসচেতন জনগণকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও পরামর্শ সেবা দেওয়া হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), বাংলাদেশ

তথ্য আবেদনে ইতিবাচক সাড়া

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৮(১) ধারার ওপর ভিত্তি করে জনৈক মুন্না দাস পৌরসভায় কী কী সেবা দেওয়া হয় সে সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সৈয়দপুর পৌরসভা মেয়রের কাছে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনটি গ্রহণ করার পর সচিব আট দিন পর তাকে আবেদনের তথ্য নিয়ে যেতে বলেন। সে অনুযায়ী আবেদন জমা দেওয়ার আট দিন পর সচিবের কাছে গেলে তিনি জানান যে আবেদনের জবাব তিনি নিজেই তৈরি করে পৌরসভা মেয়রের কাছে স্বাক্ষর করার জন্য পাঠিয়েছেন। মেয়র স্বাক্ষর করার পর তা আবেদনকারীকে দিতে সচিব আরও পাঁচদিন সময় নেন। পাঁচদিন পর সচিব মুন্না দাসকে আবেদনের জবাব সংক্রান্ত কাগজটি খুঁজে না পাওয়ার দরুণ আরও তিন দিন সময় দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনদিন পর সচিব মেয়রের স্বাক্ষর সংবলিত জবাব মুন্না দাসকে দেন।

তথ্যসূত্র: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ (আরআইবি), বাংলাদেশ

সরকারি তথ্য বিতরণে সংবাদমাধ্যম এবং স্থানীয় নেটওয়ার্কের ব্যবহার[৩৬]

নব্বইয়ের দশকে বর্ধিত ব্যয় সত্ত্বেও একটি ব্যয় পর্যালোচনামূলক জরিপে দেখা গেছে, পাঁচ বছরে উগান্ডার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৭ শতাংশ আমলাদের পকেটে গেছে, যেখানে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৫০ শতাংশেরও কম। এই ফলাফলে বিস্মিত হয়ে অর্থ আত্মসাৎ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার জেলায় জেলায় মাসিক বরাদ্দের বিস্তারিত বিবরণ সংবাদপত্র এবং রেডিওতে প্রচার শুরু করে। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য যেকোনো বরাদ্দ প্রাপ্তির সাথে সাথে জনসম্মুখে ঘোষণা দেওয়ার বিধান করা হয়। যার ফলে অভিভাবকরা এই তথ্য পেতো এবং স্থানীয় সরকার পর্যায়ে শিক্ষা বরাদ্দ কর্মসূচি সম্পর্কে জবাবদিহিতা দাবি করতে পারতো। পাঁচ বছরের মধ্যে আত্মসাতের এ হার বিস্ময়করভাবে ৮০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে নেমে আসে এবং বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা ৩.৬ মিলিয়ন থেকে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬.৯ মিলিয়ন হয়। যেসব বিদ্যালয়ে সংবাদপত্র পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল তারা তাদের তহবিল প্রবাহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের তুলনায় ১২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এভাবে একটি সহজ এবং সাশ্রয়ী নীতিপদক্ষেপ হওয়া সত্ত্বেও তথ্য প্রচার স্থানীয় সরকারের অধিকতর দায়বদ্ধতা এবং জনগণের করের অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে।

ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে তথ্য বিনিময়

ই-গভর্নেন্স তথ্য বিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপযোগী মাধ্যম যার ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাগরিক সংলাপের আয়োজন এবং তাদের মতামত গ্রহণের জন্য ই-গভর্নেন্স তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে থাকে। কার্যপ্রক্রিয়ায় শৃঙ্খলা সাধন, নিয়ম-নীতি মানসম্মত করা এবং নাগরিকদের সেবা প্রদান উন্নয়নে ই-গভর্নেন্স সাহায্য করে।[৩৭]

ভূমি সংক্রান্ত দলিলে অভিগম্যতা

জ্যামাইকার 'ইল্যান্ডজ্যামাইকা' হচ্ছে ন্যাশনাল ল্যান্ড এজেন্সির একটি সেবা। এ সেবায় পূর্বে বিভিন্ন বিভাগে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা জমির নামজারী, জমির মূল্য, জরিপ, নকশাসহ ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিস্তারিত তথ্য এক জায়গায় সংরক্ষণ করে। এক্ষেত্রে জমির প্লটের বালাম বই (ভলিউম) এবং পৃষ্ঠা নম্বর (ফলিও নাম্বার) সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এবং সহজপ্রাপ্য করা হয়। তবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবামূল্যের বিনিময়ে এসব বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করা হয়। এক জায়গা থেকেই জমির নামজারী এবং জমি ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া যায় বিধায় উপরোক্ত বিষয়ের তথ্য বিশেষ করে ভূমি জরিপকারী, পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী, আইনজীবী, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার এবং জমির ক্রেতাদের কাছে বিশেষভাবে উপযোগী।

উন্নয়নের জন্য নেটওয়ার্ক স্থাপন

প্রায় ১০০০ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন কিছু দ্বীপ নিয়ে সলোমন দ্বীপের নয়টি প্রদেশ গঠিত। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের দূরত্ব সমস্যা সমাধানের সুবিধার্থে সলোমন দ্বীপের প্রদেশগুলোর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সংযোগ গড়ে তোলা হয়। দ্যা পিপল ফার্স্ট নেটওয়ার্ক নামের একটি গ্রামীণ ই-মেইল নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয় ২০০১ সালে। টেকসই গ্রামীণ উন্নয়ন সাধন এবং কমিউনিটির ভেতরে ও বাইরে উন্নত তথ্য-বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই ই-মেইল নেটওয়ার্ক স্থাপিত।

দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা

ভারতের ফেডারেল সরকারের অফিসগুলোর দুর্নীতি অনুসন্ধানে দ্যা সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন নামের একটি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিহিংসার ভয়মুক্ত হয়ে একজন সাধারণ নাগরিক কীভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করবে সেই সংক্রান্ত নির্দেশনা এ সংস্থার ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির ব্যাপারে গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণের একটি পদক্ষেপ হিসেবে চিফ ভিজিলেন্স কমিশনার এ ওয়েবসাইট ব্যবহার করে থাকেন। উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক এবং রাজস্ব সেবা সংক্রান্ত কাজে দুর্নীতিতে জড়িত কর্মকর্তাদের নাম এতে প্রকাশ করা হয়। মূলত যেসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান এবং অভিযোগ প্রমাণসাপেক্ষে শাস্তি প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের নামই এখানে প্রকাশ করা হয়। গণমাধ্যম এ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য সংগ্রহ করে দুর্নীতির উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে। সংবাদপত্রের এক ভোটে দেখা গেছে, ৮৩ শতাংশ উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন যে, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশের একটি প্রতিরোধক প্রভাব রয়েছে।[৩৮]

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন: এগিয়ে চলা[৩৯]

বাংলাদেশের প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে এবং সেবা খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন অমূল্য ভূমিকা পালন করতে পারে। জনগণের তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি ও তথ্য অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠায় দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে জোরালো আন্দোলন পরিচালনা করে নাগরিক সংগঠনসমূহ। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ জাতীয় সংসদে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' পাস হয় এবং ১ জুলাই থেকে এটি কার্যকর হয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন সর্বোচ্চ পর্যায়ে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিচায়ক। তবে রাজনীতিতে প্রায়শই অঙ্গীকার এবং বাস্তবায়নের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। তথ্যই শক্তি - এই কথাটির মধ্যেই নিহিত আছে তথ্য অধিকার আইনের প্রধান চ্যালেঞ্জ। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তথ্যের অবাধ আদান-প্রদানের মানসিকতা গড়ে তোলা।

রাজনৈতিক অঙ্গীকারের গুরুত্ব

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের সার্থকতা এবং তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন নির্ভর করে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সরকারের প্রতিশ্রুতির মাত্রার ওপর, যা কিনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলোর স্পষ্ট ঘোষণা এই আইন পাশের পেছনে ভূমিকা রেখেছিল। ২০০৮ এর ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পথ পরিক্রমায় একটি বিশেষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল তথ্য অধিকার আইন। বর্তমান সরকার গঠনকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রধান বিরোধীদল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র নেতৃত্বাধীন প্রধান দু'টি নির্বাচনী জোটসহ সকল রাজনৈতিক দল তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিল।[৪০] বিশেষ করে আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার করে এবং একইভাবে বিএনপি-ও তাই করেছিল, যদিও আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপারে অধিকতর সুনির্দিষ্ট ছিল। তথ্য অধিকার আইন জন-আলোচনা, জন-চাহিদা, সংবাদ প্রতিবেদন ও মন্তব্য প্রতিবেদনের মূল আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। নবম সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের করা নির্বাচনী ইশতেহারের দিকে একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে সহজে অনুধাবন করা যায় যে, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে তথ্য অধিকার আইন তার প্রতিশ্রুতির সাথে মিশে গিয়েছিল।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মূল চ্যালেঞ্জ হলো তথ্য মানুষকে যে ক্ষমতায়িত করে, আর এর ফলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার যে নিশ্চিত হয়-এই মূলমন্ত্রকে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সংস্কৃতির কেন্দ্র বিন্দুতে স্থান দেওয়া। যাদের হাতে ক্ষমতা তারা যদি জনগণকে ক্ষমতায়িত করতে বাস্তবেই আগ্রহী হন, তাহলেই তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সহজ হবে। এরূপ মানসিকতা সৃষ্টি ব্যতিরেকে তথ্য অধিকার আইনের যথার্থতা অর্জন অসম্ভব।

তথ্য অধিকার আইনের জাতীয় বাস্তবায়ন কৌশল

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে একটি কৌশলগত কাঠামো এবং বিশেষ করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা প্রয়োজন। কৌশল তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের বিশেষত তথ্য কমিশন, নাগরিক সমাজ, এনজিও নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম ও অন্যদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব থাকবে তথ্য কমিশনের ওপর। কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের আওতাধীন এনজিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক নিজস্ব পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

আইন বাস্তবায়নের শুরুতেই সকল সরকারি অফিসে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার কর্মস্থল এমন জায়গায় হওয়া উচিত যেখানে সাধারণ জনগণ সহজে যেতে পারে। সরকারি মন্ত্রণালয়ের মতো যেসব অফিস ও প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বরাদ্দ জরুরি। বাংলাদেশের মতো দেশে সম্পদের ঘাটতি একটি প্রধান সমস্যা হয়ে উঠতে পারে যেখানে গোপনীয়তার সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে তথ্য প্রদান ও গ্রহণকারীর প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা সৃষ্টিতে প্রচুর বিনিয়োগ করতে হবে তাই নয় বরং তথ্য সংরক্ষণের আধুনিকায়নের জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যও ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশেও সম্পদের ঘাটতি তথ্য প্রাপ্তি বাস্তবায়নের প্রধান বাধা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।[৪১] অতএব, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে জাতীয় বাস্তবায়ন কৌশলে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদিতে অর্থায়নের যথাযথ পরিকল্পনাও থাকা উচিত। বার্ষিক জাতীয় বাজেটে এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বাজেটে এই ধরনের বরাদ্দের প্রতিফলন থাকতে হবে।

স্বল্প পরিসরে এই ধরনের কোনো জাতীয় বাস্তবায়ন কৌশল পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা যেতে পারে। কয়েকটি মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের বাস্তবায়ন কৌশলটি পরীক্ষামূলকভাবে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। পরবর্তীতে একটি সময়ভিত্তিক ও যথাযথ পরিকল্পনামাফিক কৌশল তৈরির মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠানে এই অভিজ্ঞতার অনুরূপ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের প্রাধান্য

তথ্য প্রকাশ করাটা নিয়ম এবং না প্রকাশ করাটা ব্যতিক্রম - এই বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়ে জাতীয় বাস্তবায়ন কৌশলে সর্বোচ্চ সম্ভব স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নীতিকে অধিক প্রাধান্য দিতে হবে। বেশিরভাগ দেশের তথ্য অধিকার আইনের মতো প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ যেন কেউ তথ্য চাওয়ার আগেই স্বপ্রণোদিতভাবে ওয়েবসাইটে দেওয়া বা প্রতিবেদন ছাপানোসহ অন্যান্য মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করে সেই ধরনের ধারা বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনেও রয়েছে। এইভাবে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ সরকারি বা বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের ওপর জনগণের বিশ্বাস তৈরি করতে পারে। সরকারি ক্রয়-প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম যদি অন-লাইনে সহজলভ্য করা যায় তাহলে সামনে কোন কোন দরপত্র আসছে এবং কোন কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেই সম্পর্কে সকলের জন্য জানার একটি সমান সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই ধরনের পদক্ষেপ ক্ষমতার অপব্যবহার কমিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বিভিন্ন দেশের কার্যকর তথ্য প্রাপ্তি বাস্তবায়নে দেখা যায়, চাওয়ার আগে যদি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য দেওয়া হয় তাহলে তথ্য অনুরোধের সংখ্যা কমে যায় এবং তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও দেরির বিষয়টি কমে আসে।

একটি গতিশীল ও কার্যকর তথ্য কমিশন

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যেখানে তথ্য কমিশন স্বাধীন, পর্যাপ্ত সম্পদশালী ও ক্ষমতায়িত হয়ে তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ তদারকি করতে পারে সেখানে কমিশন তথ্যের চাহিদা পূরণে, জনসাধারণের অভিযোগ চিহ্নিতকরণে এবং সর্বোপরি সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা এমনকি সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজে তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের স্বতঃস্ফূর্ততা জনগণের মধ্যে অনেক প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে। কমিশনের সক্ষমতা সৃষ্টি এবং দৃশ্যমান ফল ও কার্যকরতা প্রতিষ্ঠায় এর নিজস্ব কৌশল এবং কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা দরকার। যার ওপর নির্ভর করে কমিশন উচ্চতর জন-আস্থা, গ্রহণযোগ্যতা, পেশাদারি উৎকর্ষতা ও গতিশীলতা অর্জন করতে পারে। আর্থিক, জনবল ও কারিগরি দিক থেকে পর্যাপ্ত সম্পদশালী হতে হলে কমিশনের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা বজায় রেখে সরকারের সাথে একটি কার্য-সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত।

কমিশনার এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা যেহেতু তুলনামূলক নতুন একটি বিষয় নিয়ে কাজ করবেন, এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার বিশেষত নাগরিক সমাজ ও এনজিও-দের সহযোগিতায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশনের কর্ম-পরিকল্পনা থাকতে হবে।

আইন অনুসরণ করে তথ্য অধিকারের বিধানাবলী তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে তা যেন অবশ্যই সহজ ভাষায় হয়। তথ্য কমিশনের স্থানীয় কার্যালয়ের অনুপস্থিতিতে প্রশাসন, গণগ্রন্থাগার, ডাকঘর এবং এনজিও-র সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রমটি চালাতে পারে। কমিশন আইনটি বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের সাথে, বিশেষ করে, সংসদীয় কমিটিগুলোর সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে।

কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশনের কার্যক্রমও তদারক করা প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি আসলে কমিশনেরই দায়িত্ব। কিন্তু কমিশন তথ্য অধিকার ফোরাম এবং গণমাধ্যমের মতো নাগরিক সমাজের অন্যান্য সংগঠনকেও তদারকির দায়িত্বে সম্পৃক্ত করতে পারে। যদি আইন ও তথ্য কমিশন তথ্য সরবরাহকারীদের জন্য ভীতির কারণ হয় তাহলে এই আইনের লক্ষ্য অর্জন সফল হবে না। কর্তৃপক্ষসমূহ এবং কমিশনের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা ও সহযোগিতা সম্ভাব্য ভুল ধারণা ও অনাস্থা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে।

‘সততার দ্বীপে’ পরিণত হচ্ছে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উত্তরবঙ্গের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এই হাসপাতালকে সততার দ্বীপ (Island of Integrity) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য টিআইবি'র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)-রংপুর ও ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) এর ব্যানারে একদল তরুণ স্বেচ্ছাসেবক ২০০৫ সাল থেকে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নের জন্য সনাক ও ইয়েস কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভা, সেবাগ্রহীতাদের সাথে দলীয় আলোচনা, ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা, তথ্য বোর্ড এবং অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স স্থাপন করেছে। এলাকার কেউ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলে ইয়েস সদস্যরা তথ্য বোর্ড থেকে সেবার মূল্য দেখে নিতে অনুরোধ করে। ইয়েস সদস্যদের কার্যক্রমের ফলে টিকিট কাউন্টারের সেবার মান উন্নত হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে অবৈধ আর্থিক লেনদেন হ্রাস পেয়েছে। রোগীদের পরীক্ষা করার সময় ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের উপস্থিতি হ্রাস পেয়েছে। হাসপাতালের তথ্য প্রদান পদ্ধতির মান উন্নত হয়েছে। সনাক ও ইয়েস সদস্যদের কার্যক্রমের শুরুতে হাসপাতালের মৌলিক তথ্য যেমন ওষুধের তালিকা, খাবারের বরাদ্দ, কর্তব্যরত ডাক্তারের নাম, সেবার সরকারি ফি প্রভৃতি সেবাগ্রহীতাদের জানানোর কোন পদ্ধতি ছিল না। প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে, এসব তথ্য এখন হাসপাতালের ভেতরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। পূর্বে হাসপাতালের করিডোর এবং রোগীর কক্ষ নোংরা থাকত। কিন্তু বর্তমানে এগুলো প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয়। ‘রশিদ ব্যতীত লেনদেন করবেন না’- হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে কর্তৃপক্ষ এ ধরনের সতর্কীকরণ নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে এবং পরিচালক এখন নিয়মিত ডাক্তার ও নার্সদের খোঁজ খবর নেন।

সনাক ও ইয়েস সদস্যদের কার্যক্রম শুরুর আগে রোগীদের অভিযোগ ও পরামর্শ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানোর কোনো ব্যবস্থা না থাকায় একদিকে সেবাগ্রহীতারা যেমন তাদের অভিযোগ জানাতে পারত না, অপরদিকে কর্তৃপক্ষও সেবাগ্রহণকারীদের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সম্পর্কে জানতে পারত না। সেবাগ্রহীতাদের মতে অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স হাসপাতালে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মতে সনাক ও ইয়েস সদস্যদের কার্যক্রমের ফলে হাসপাতালের প্রকৃত অবস্থা তারা জানতে পেরেছে এবং হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ও দিক নির্দেশনা পেয়েছে, যার ফলে সেবার মানে উন্নতি সাধিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), বাংলাদেশ

গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিহার

গণতান্ত্রিক এবং জবাবদিহিতামূলক শাসনের অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ গোপনীয়তার সংস্কৃতি। গোপনীয়তা ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ ও স্বেচ্ছাচারিতাকে উৎসাহিত করে যা জবাবদিহিতাবিহীন শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনেক সরকারি এমনকি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও তথ্য গোপন করে থাকে।[৪২] সাধারণত সরকারের ভেতরের এবং বাইরের বেশিরভাগ কর্মকর্তাদের তথ্য প্রকাশে অনীহা থাকে, কারণ তারা মনে করে এর ফলে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা হ্রাস পাবে। এজন্য মানসিকতার মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

অবাধ তথ্য প্রকাশের কথা বলা যত সহজ, কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, অক্ষমতা এবং সর্বোপরি মানসিকতার পরিবর্তন একটি বড় সমস্যা। তাই একটি গুণগত পরিবর্তনের জন্য গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিহার করে তথ্য প্রকাশের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। কর্মকর্তাদের মানসিকতা পরিবর্তন প্রয়াসের সাথে সাথে তাদের বিশেষ করে তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণসহ সক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য তথ্য আবেদন প্রক্রিয়া এবং তথ্য কর্মকর্তাদের বিস্তারিত ঠিকানার ব্যাপক প্রচারও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি প্রধান দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়াকে প্রাধান্য দিতে হবে যারা বিভিন্ন সময়ে তাদের সহকর্মী এবং অন্যদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা খুব একটা সহজ হবে না, কিন্তু তথ্য ধারনকারীরা তথ্য প্রকাশের গুরুত্ব যত শীঘ্র অনুভব করতে পারবে- কীভাবে এটি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করে, জন-আস্থা তৈরি করে এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি করে- তত দ্রুত এই আইনের সুফল দৃষ্টিগোচর হবে।

তথ্য চাওয়া ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যেন কোনো বিশেষ প্রচেষ্টার দরকার না হয়। এটি তথ্য আবেদনকারীর জন্য সহজ হওয়া উচিত। তথ্য কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে যেন অবশ্যই সচেতন থাকেন যে, শুধুমাত্র আইন অনুযায়ী তথ্য দেওয়া নয়, বরং যদি কোনো ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান করা না যায় তবে তা যেন যুক্তিযুক্ত হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য না দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কঠোর প্রয়োগসহ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের তদারকি পদ্ধতিও সুস্পষ্ট হতে হবে।

তথ্য অধিকার আইনকে মূলধারায় নিয়ে আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হতে পারে সরকারি ও এনজিও খাতের কর্মকর্তা ও কর্মীদের আচরণবিধিতে তথ্য প্রকাশের অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত করা।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে সুদূরপ্রসারী লক্ষ রয়েছে তার সাথে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পদক্ষেপের সংযোগ তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতির রূপান্তর এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে সক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে সাহায্য করতে পারে।

তথ্য অধিকার-বান্ধব তথ্য ব্যবস্থা

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তথ্য প্রদানকারীদের সক্ষমতার অভাব। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনেক পুরনো হওয়ার কারণে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রদানের

তথ্যের স্বাধীনতা প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সাহায্য করেছে

বাংলাদেশের শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলায় টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সনাক ও ইয়েস গ্রুপ রানীগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করছে। তথ্য জানানোর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ করে থাকে। সামাজিক জবাবদিহিতার বিভিন্ন কৌশল, যেমন তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে সভা, স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময়, অভিভাবক সমাবেশ, যৌথ বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে। এর ফলে যে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ছিল এক রকম নিষ্ক্রিয়, এখন তারা প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার নিয়মিত সভা করছে। এসএমসি'র প্রত্যেক সদস্য এখন আগের চেয়ে সক্রিয় এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। শিক্ষকরা আগের চেয়ে অনেক নিয়মিত ও সঠিক সময়ে উপস্থিত হন। বই বিতরণে এখন আর দেরি হয় না। ছাত্র-ছাত্রীরা উপবৃত্তির জন্য তালিকা তৈরিতে আগের চেয়ে অনেক সচেতন ও সতর্ক এবং সরকারের ৪০% কোটাই তারা পূরণ করতে পারছে। পরীক্ষার ফি এখন সরকারি নিয়মানুযায়ী সংগ্রহ করা হয়। মা সমাবেশের ফলে শিক্ষা বিষয়ে মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার খোঁজ নিতে এখন নিয়মিত স্কুলে আসেন। ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষের তদারকি আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সনাক-নালিতাবাড়ীর নিজস্ব উদ্যোগে স্কুলের বারান্দায় অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শন বইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সাত সদস্যবিশিষ্ট স্কুল ওয়াচ গ্রুপ গঠিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টান্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), বাংলাদেশ

বাস্তব সীমাবদ্ধতার অজুহাতে তথ্য অনুসন্ধানকারীকে তথ্য না দেওয়া বা প্রতারিত করার পথ সহজ হয়। তথ্য ব্যবস্থাপনার একটি আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থা তৈরির কোনো বিকল্প নেই যা কিনা স্পষ্ট নির্দেশনাসহ সহজ, নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ তথ্য সংরক্ষণ ও সহজ লভ্যতা ত্বরান্বিত করতে পারবে। এসব ছাড়া এমনকি সর্বোচ্চ অঙ্গীকার এবং সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য ব্যবস্থা তথ্য অধিকারের চেতনার প্রতি অসংবেদনশীল থাকবে।

তথ্য প্রদানকারী এবং তথ্য আবেদনকারী উভয়কেই সহায়তা করার জন্য তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যাতে স্বপ্রণোদিতভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণে তথ্য প্রকাশ করে তা নিশ্চিত করতে হবে। অনুরোধে প্রকাশিতব্য তথ্যসমূহের জন্য তথ্য অধিকার আইনের অধীন প্রকাশের দায়বদ্ধতা অনুসারে তথ্যসমূহের শ্রেণীকরণ করা সহায়ক হবে। যেকোনো ধরনের দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য অব্যাহতির তালিকা অবশ্যই স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের ৩২ (২) নং অনুচ্ছেদে যেখানে দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অব্যাহতির তালিকায় থাকা সত্ত্বেও অব্যাহতি না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তথ্য ব্যবস্থাপনা অবশ্যই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারসমৃদ্ধ এবং আধুনিক হতে হবে।

তথ্য অধিকার-সহায়ক আইনি ব্যবস্থা

তথ্য অধিকার আইনের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে সহায়ক আইনের ওপর।[৪৩] অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও বেশকিছু আইনি এবং নীতিগত ধারা রয়েছে যা তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগকে কঠিন করে তুলতে পারে।

যদিও বিদ্যমান কোনো আইনের সাথে এই আইনের বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইনের ধারাসমূহকে বিদ্যমান আইনের ধারাসমূহের ওপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে যা তথ্য অধিকারের কার্যকর প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করবে। কী ধরনের তথ্য এবং কতটুকু তথ্য প্রকাশ করতে হবে এবং কোথায় সীমারেখা টানতে হবে এ ব্যাপারে সরকারি কর্মকর্তারা অনিশ্চিত এবং অনিরাপদ বোধ করতে পারেন। গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার বাধাগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হল দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ১৯২৩, সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ (১২৩-১২৪), কার্যপ্রণালী বিধি ১৯৯৬ (বিধি ২৮-১), সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি ১৯৭৯ (বিধি ১৯) এবং রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণের সময় নেওয়া শপথের গোপনীয়তার ধারা। তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সকল আইন এবং বিধিকে তথ্য অধিকার আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টিকারী যেকোনো অসামঞ্জস্যতা ও দ্বন্দ্ব দূর হয়।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং একটি কার্যকর তথ্য কমিশনের জন্য আদালত এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের কাছ থেকে সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন হবে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং প্রভাবমুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অপরিহার্য। প্রয়োজন অনুযায়ী সমাধান দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে, আইনের এখতিয়ারের মধ্যে সীমা ও অব্যাহতি নির্ধারণের জন্য বিচার বিভাগের সততা ও সক্ষমতা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি তথ্য অধিকার সহায়ক জাতীয় সততা ব্যবস্থার পূর্বশর্ত হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহের দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকা, যা সমর্থিত হবে তথ্য অধিকার-বান্ধব আইনি ব্যবস্থার দ্বারা।

নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারের নয়। এক্ষেত্রে এনজিও, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম এবং বেসরকারি খাতকে অবশ্যই সরকারের উদ্যোগ বাস্তবায়নে দায়িত্ব নিতে হবে এবং বিশেষ করে সাধারণ মানুষকে এই আইন ব্যবহারে সাহায্য করতে হবে। আইনের সহজলভ্যতা, ব্যক্তির নিজের জন্য এর উপযোগিতা, এই আইন ব্যবহারের মাধ্যম এবং সর্বোপরি এই আইন সাধারণ জনগণকে ক্ষমতায়িত করতে পারে সেই ব্যাপারে আস্থা স্থাপনের মাধ্যমে তথ্যের চাহিদা সৃষ্টিকারীর সক্ষমতাকে শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক সমাজের সম্পৃক্ততা ছাড়া তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্য ম্লান হয়ে যায়।

এনজিও কর্মকর্তা, গণমাধ্যম কর্মী, আইনজীবী ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশাজীবীকে প্রশিক্ষণ প্রদান তথ্যের চাহিদাকে উৎসাহিত করতে পারে যা সরকারি কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রদানের একটি অধিক কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সাহায্য করে থাকে। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দুর্নীতিবিরোধী কর্মী হিসেবে সরকারি চুক্তির ব্যাপারে তথ্য জানতে চেয়ে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া খাতে অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে তথ্য প্রদানকারী এবং তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি ও সরবরাহের প্রচারকারী হিসেবে নাগরিক সমাজের দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে। তথ্য প্রকাশের জন্য সরকারি সংস্থার ওপরে প্রযোজ্য আইনের ধারাসমূহ সমানভাবে বেসরকারি সংস্থার ওপরও প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে অনুরোধের ভিত্তিতে তথ্য প্রদান নয় বরং স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ সহায়ক নীতি গ্রহণ করে এবং সময়ানুগ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার মাধ্যমে খাত হিসেবে এনজিও এবং নাগরিক সমাজের এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। নাগরিক সমাজের অবশ্যই সরকার ও তথ্য কমিশনের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সক্ষমতা তৈরির প্রচারণায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা উচিত।

সমাজ যত বেশি তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের দিকে যাবে, তত বেশি তথ্য জনগণের জন্য সহজলভ্য হবে। তথাপি, বাস্তবে দেখা যায় সবচেয়ে সুশিক্ষিত বা আলোকিত নাগরিকদের পক্ষেও সব ধরনের সহজলভ্য তথ্য কার্যকরভাবে ব্যবহার করা অসম্ভব। সাধারণভাবে জনগণের তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা ছাড়াও জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংবলিত উপকরণ তৈরি এবং প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এনজিও, যাতে জনগণ বুঝতে পারে কীভাবে তাদের অধিকার নিশ্চিত হবে। এসকল উপকরণে জনগণের কী তথ্য প্রয়োজন, কী তাদের চাওয়া উচিত, কীভাবে চাইতে হবে এবং প্রাপ্ত তথ্য কীভাবে ব্যবহার করে তাদের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারবে ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

জনগণের তথ্য অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকার বেশকিছু চমৎকার উদাহরণ রয়েছে। ভারতের রাজস্থানের এমকেএসএস-এর অভিজ্ঞতা তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য অধিকার প্রয়োগের একটি বহুল প্রচারিত উদাহরণ। এমকেএসএস নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের অনেক উদ্যোগকে গতিশীল করেছে। অনেক এনজিও নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আইনি সহায়তা প্রদান করার কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন এনজিও তাদের নিজস্ব এবং প্রকল্প-ভিত্তিক কার্যক্রমে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি করতে পারে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকারের মতো সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থায় তথ্য ও পরামর্শমূলক প্রচারাভিযান চালাতে পারে।[৪৪]

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজের ভূমিকা অন্যান্য ক্ষেত্রের অ্যাডভোকেসির মতোই। সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়িত করা এবং এভাবে বৃহত্তর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গণতান্ত্রিক চর্চাকে উৎসাহিত করা। তথ্য অধিকার ফোরামের মত নাগরিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলো তথ্য অধিকার ও এর প্রয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করতে সরকার, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সংক্রান্ত বিশেষ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে পারে।

নাগরিক সমাজের ভূমিকাও কৌশলগত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সাথে অংশীদারিত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। জনগণের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার মূল বাহন হচ্ছে একটি স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম। জনগণের আগ্রহের বিষয়বস্তুকে নজরে রেখে এবং তারা কী জানতে চায় তা বিবেচনা করে তথ্যের সম্পূর্ণ ভান্ডার জনগণের কাছে মুক্ত, সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য গণমাধ্যম অন্য যেকোনো স্টেকহোল্ডারের চেয়ে বেশি কৌশলগত অবস্থানে রয়েছে। নাগরিক সমাজকে সাথে নিয়ে তথ্য অনুসন্ধানকারীর পক্ষে কার্যকর চাহিদা তৈরি করা এবং তথ্য সরবরাহকারীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিচার বিভাগের মত স্বাধীন গণমাধ্যমও গণতন্ত্রের একটি মজবুত ভিত্তি হিসেবে সাধারণভাবে এবং তথ্য অধিকারের আলোকে সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দায়বদ্ধ করার চাপ প্রয়োগ করতে পারে।

অন্যান্য খাতের মতো গণমাধ্যমও চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্ত নয়। এই খাতেও ‘মুনাফা অর্জন’ এবং ‘জনগণকে জানানো’র মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে। গণমাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ তথ্যের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে মতামত প্রভাবিত করার ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে যা তথ্য অধিকারের মূল চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। গণমাধ্যমের মধ্যেই একটি মজবুত এবং নীতিভিত্তিক স্ব-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়ক হতে পারে।

ইন্টারনেট তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে আরেকটি সম্ভাবনাময় শক্তিশালী স্টেকহোল্ডার। এর প্রসারের সাথে সাথে তথ্যের জগৎ ক্রমবর্ধমানভাবে গণতন্ত্রায়িত হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতে ইন্টারনেটের ব্যবহার তথ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সত্যিকার অর্থে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে পারে।

বাস্তবায়ন তদারকি

আইন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং আইনের বিভিন্ন বিধি ও ধারার ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য তথ্য অধিকার আইনে 'তথ্য কমিশন' গঠন বাধ্যতামূলক থাকা জরুরি। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছে তা মূল্যায়ন করার জন্য তদারকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বাস্তবায়ন কার্যক্রমে এবং আইনের বিভিন্ন বিধি বা ধারায় যেকোনো ধরনের সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও পরিবীক্ষণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। চলমান পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ফলে বাস্তবায়নাধীন উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে যাচাই, পর্যালোচনা এবং শক্তিশালী করা সম্ভব হয়। এতে সফল উদ্যোগগুলো পরিশুদ্ধ ও অনুকরণ করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রগুলোতে বেশি কাজ করতে হবে তা চিহ্নিত করা যায়।

সংসদের জন্য বার্ষিক ও তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন প্রণয়ন

তথ্য অধিকার আইন কতটুকু মানা হচ্ছে তার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে 'বার্ষিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন'। ব্যর্থ ও সফল কাজ, শিক্ষণীয় বিষয় এবং অনুকরণীয় নতুন উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য অংশ এই প্রতিবেদন তুলে ধরতে পারে। এছাড়া কোথায় কোথায় সংস্কার দরকার সে বিষয়েও নির্দেশনা দিতে পারে। বার্ষিক প্রতিবেদন নির্দিষ্ট কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়, যেমন দুর্বল নথি ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তির অধিক কার্যকর ব্যবহার বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করে থাকে অথবা ভাল বা দুর্বল ভূমিকা পালনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানকে তুলে ধরে থাকে। বিশেষ করে এ আইন সম্পর্কিত প্রাথমিক উদ্দীপনা কাটার কয়েক বছর পর তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সমস্যার ওপর সংসদ এবং জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

যদি কোনো দেশে তথ্য কমিশন থাকে তাহলে কমিশনই সাধারণত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। তবে কখনো কখনো আইনের বিধি অনুসারে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। কিন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠান হয়ে সরকারের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা বাস্তবসম্মত নয়। তাই একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক প্রতিবেদন (সংস্কার সাধনের সুপারিশসহ) প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া উচিত।

আইনের যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে সঠিক মন্তব্য দেওয়ার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য থাকা নিশ্চিত করতে হবে। আর এজন্য আইন বাস্তবায়নকারী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান নিয়মিতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার সঠিক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। এক্ষেত্রে আইন বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল প্রতিষ্ঠান একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করবে এবং এ ব্যবস্থা সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের ভেতরে একই ধারায় তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করবে। তথ্য কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষের জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং এর সংরক্ষণ বা পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করা দরকার। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং তা একত্রীকরণের জন্য ন্যূনতম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে সকল তথ্য কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রতি মাসে প্রক্রিয়াজাত মূল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং একত্রিত করা এবং পরে তা আইন বাস্তবায়নকারী মূল প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো উচিত। যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় তার একটি পরিসংখ্যানও সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা প্রয়োজন। এর ফলে, কতটা কার্যকরভাবে আইনটি বাস্তবায়িত হচ্ছে সেই সম্পর্কে একেবারে সাম্প্রতিক তথ্য জনগণ জানতে পারবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য সংগৃহীত পরিসংখ্যান সরকারি সংস্থার প্রধান, বাস্তবায়নকারী মূল প্রতিষ্ঠান এবং তথ্য কমিশনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবীক্ষণ মাধ্যম হতে পারে। এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে কিনা তা নিয়মিতভাবে যাচাই করা সম্ভব। এ পরিসংখ্যান কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের আরও প্রশিক্ষণ অথবা সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রাপ্তির কোনো আবেদন বা আপিলের মীমাংসা করতে নিয়মিতভাবেই নির্দিষ্ট সময়সীমা লঙ্ঘন করে কিনা তা এই পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা সম্ভব। সময়সীমা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থতা ঐ বিভাগের ওপর শাস্তির মাত্রা এবং কঠোরতাও বৃদ্ধি করতে পারে।

সফল দৃষ্টান্ত হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন অবশ্যই সংসদে উত্থাপন করা দরকার। নীতি-নির্ধারক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা যাতে সত্যিকারভাবেই এসব প্রতিবেদন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তা নিশ্চিত করতে সংসদে উপস্থাপন হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। এর ফলে বার্ষিক প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে নীতি-নির্ধারক এবং মন্ত্রীরা আইন বাস্তবায়নের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন। কানাডা ও যুক্তরাজ্যে বার্ষিক প্রতিবেদনগুলোকে নির্দিষ্ট সংসদীয় কমিটিতে অবশ্যই পাঠাতে হয়। পরবর্তীতে এ কমিটি বিস্তারিত প্রতিবেদনসহ বার্ষিক প্রতিবেদনগুলোকে সংসদে পাঠায়। সংসদে প্রতিবেদন পাঠানোর পাশাপাশি আইন বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য সফলতা এবং কার্যক্রমে পিছিয়ে পড়ার কারণগুলোর সারমর্ম তুলে ধরে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিও তৈরি করা উচিত। বাস্তবায়নের সমস্যা নিরসনে প্রচার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সরকারি ওয়েব সাইটগুলোতে সকল বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং মুদ্রিত সংস্করণ সহজপ্রাপ্য করা দরকার। পাশাপাশি জনগণের পরিদর্শনের জন্য প্রতিটি সরকারি অফিসে বার্ষিক প্রতিবেদন সহজপ্রাপ্য করা উচিত। এ প্রক্রিয়া অনুসরণের ফলে কতটা ভালোভাবে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন হচ্ছে তা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারবে।

কিছু কিছু তথ্য অধিকার আইন নির্দিষ্ট বিষয় বা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রকাশ করার অনুমতি তথ্য কমিশনকে দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কানাডার তথ্য কমিশনার জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো অভিযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও নিজস্ব অনুসন্ধান পরিচালনা এবং এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এ ক্ষমতা পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত অভিযোগসহ আইন না মানা বা বাস্তবায়নের ধরন অনুসন্ধান করার ক্ষমতা থাকার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশের ন্যায়পাল সেখানকার 'তথ্য স্বাধীনতা আইন' এর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করেন। তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান এবং প্রতিবেদন প্রণয়নে অনুমতি দেওয়ার জন্য তাঁকে ব্যাপক বর্ধিত ক্ষমতা দেওয়া হয়। বিশেষকরে ন্যায়পাল এ আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া করতে গিয়ে সাধারণ জনগণ অধিক কালক্ষেপণের যে সমস্যার মুখোমুখি হয় সেই সংক্রান্ত বিষয়ে তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান করার অনুমতি দিয়ে থাকেন। বিশেষ ক্ষমতায়িত হওয়ার পর ন্যায়পালের প্রথম কাজটি ছিল কালক্ষেপণ সংক্রান্ত একটি অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

সরকারি কর্তৃপক্ষের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রতিবেদনের ব্যবহার

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের জবাব দিতে সরকারি প্রশাসনের কালক্ষেপণের সমস্যা দূর করার জন্য কানাডায় পর পর বেশ কয়েকজন তথ্য কমিশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তথ্য প্রাপ্তিতে সময়ক্ষেপণকে প্রথম কমিশনার তথ্য অধিকারে 'মারাত্মক হুমকি' হিসেবে শনাক্ত করেন। অন্যদিকে তথ্য প্রকাশে নিয়মিত কালক্ষেপণের প্রবণতাকে দ্বিতীয় কমিশনার 'নিরব কেলেঙ্কারি' বলে সম্বোধন করেন।[৪৫] এ জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য তথ্য কমিশনার 'রিপোর্ট কার্ড' নামে একটি ব্যবস্থা চালু করেন। একটি নির্দিষ্ট বিভাগের সম্পাদিত কাজের মাত্রা যাচাই, কালক্ষেপণের নির্দিষ্ট কারণ শনাক্ত, ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রণয়ন, এবং বাস্তবায়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিরীক্ষা করতে এ কার্ড ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। কমিশনার কর্তৃক প্রণীত প্রতিটি বার্ষিক প্রতিবেদনে তথ্য আইন বাস্তবায়নে কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের ফলাফল গ্রেডিং আকারে দেওয়া হয়। দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত এসব প্রতিষ্ঠানের 'এ' থেকে 'এফ' পর্যন্ত গ্রেডিং করা হয়। আইনগতভাবে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কী পরিমাণ আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু জবাব দেওয়া হয়নি তার শতকরা হারের ওপর এ গ্রেডিং নির্ভর করে।

এ গ্রেডিং ব্যবস্থার ফলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং এমনকি সংসদ সদস্যদের কাছে আইন বাস্তবায়নকারী সরকারি কর্তৃপক্ষকে কার্য সম্পাদনে তাদের দুর্বল ভূমিকার কারণ ব্যাখ্যা করতে হয়। তথ্য কমিশনার কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন কেবলমাত্র কানাডার সংসদে উত্থাপিত হয় না, বরং এটি তথ্য প্রাপ্তি বিষয়ক হাউজ কমিটি দ্বারাও পর্যালোচিত হয়। এ প্রক্রিয়াটি কার্য সম্পাদনে দুর্বল ভূমিকা পালনকারী বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়গুলোর ওপর তাদের কাজের পর্যালোচনা এবং পদ্ধতি সংশোধনের জন্য চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এ ব্যবস্থা সম্পাদিত কাজের মাত্রা যাচাইয়ের একটি সৃষ্টিশীল পরিমাপকও যা কিনা গণমাধ্যমকে সহজে আকৃষ্ট করে। কেননা এ ব্যবস্থা সাধারণ মানুষ খুব সহজে বুঝতে পারে।

সংস্কারের জন্য সুপারিশমালা

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সংস্কার সাধনের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদনগুলো যেন সুপারিশ প্রস্তাব করে তা অনেক তথ্য অধিকার আইনেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব সুপারিশের মধ্যে হতে পারে কোনো নির্দিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও আধুনিকায়নের জন্য এ আইনসহ অন্যান্য আইন, সাধারণ আইন অথবা তথ্য প্রাপ্তির অধিকার কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের সংস্কার অথবা সংশোধনের জন্য সুপারিশ। দক্ষিণ আফ্রিকায় মানবাধিকার কমিশন প্রয়োজন অনুযায়ীই এ ধরনের সুপারিশ করতে পারে। ভারত ও যুক্তরাজ্যের তথ্য কমিশনারদের সংসদে পেশ করা বার্ষিক প্রতিবেদনে সংস্কারের জন্য সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করার কথা। বার্ষিক প্রতিবেদন ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও যুক্তরাজ্যের তথ্য প্রাপ্তি আইন আলাদাভাবে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে কার্যদক্ষতা উন্নয়নে সুপারিশ করতে পারে। যেখানে পরিবীক্ষণে দেখা যায় যে, আইনের চেতনা ধারন করে সরকারি প্রতিষ্ঠান তার বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করে না, সেখানেই এরূপ সুপারিশ প্রদান করা হয়।

সরকারের সার্বিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় পর্যন্ত বাস্তবায়নের সমস্যা সক্রিয়ভাবে শনাক্ত করার কাজে সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যবহৃত হতে পারে। এ ধরনের ধারা বা নীতিমালা সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের ভেতরে সত্যিকার ‘তথ্য যোদ্ধা’ হিসেবে কাজ করতে পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলোকে ক্ষমতায়িত করে থাকে। ‘তথ্য ব্যবস্থা’কে শক্তিশালী করতে হবে - এরকম দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই প্রধান স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে কাজ করার জন্য ব্যাপক কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলোকে ক্ষমতায়িত করা হয়। আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন স্বচ্ছতা এবং সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন আইন মেনে চলায় উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ প্রদানের ক্ষমতা দৃঢ়তার সাথে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

পল্লী তথ্যকেন্দ্র – জীবনকে করে স্বাভাবিক

সহর বানু নামের ৯০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা থাকেন ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুরের রেলগেইট পাড়ায়। তিনটি মেয়ে থাকা সত্ত্বেও কেউ তার দেখাশুনা করে না, এমনকি তারা কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করে না। বেসরকারি সংস্থা ডি.নেট পরিচালিত পল্লী তথ্যকেন্দ্রের তথ্য কর্মকর্তা নিলুফা ইয়াসমিন নিলুর বাসায় ২০০৫ সাল থেকে সহর বানু গৃহপরিচারিকার কাজ করেন এবং এই সূত্রে তখন থেকেই নিলুফা ইয়াসমিন সহর বানুকে চিনতেন। সহর বানু এই কাজ থেকে মাসে ৩০০ টাকা বেতন এবং প্রতিদিন তিন বেলা খেতে পান। এছাড়া তার আর কোনো আয় ছিল না। পল্লী তথ্যকেন্দ্রে কাজ করার সুবাদে তথ্য কর্মকর্তা নিলুফা জানতে পারেন যে, বয়স্ক ভাতা পাওয়ার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ থাকা সত্ত্বেও সহর বানুর নাম এই ভাতার তালিকায় নেই। পরবর্তীতে তিনি সহর বানুর নাম বয়স্ক ভাতার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপজেলা সমাকল্যাণ অফিস ও স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনারের সাথে যোগাযোগ করেন এবং সহর বানু ভাতা পান। যদিও ভাতার টাকা যথেষ্ট ছিল না, তথাপি এটি সহর বানুর জীবনকে স্বাভাবিক ও চিন্তামুক্ত করে। আর এই ঘটনাটির সবচেয়ে সার্থক অংশ হচ্ছে – সঠিক ব্যক্তি শনাক্ত করে তার অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকারের সমাজকল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করার নিমিত্তে পল্লী তথ্যকেন্দ্রের একজন তথ্য কর্মকর্তার উদ্যোগ গ্রহণ এবং সে উদ্যোগে সাফল্য।

তথ্যসূত্র: ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক (ডি.নেট), বাংলাদেশ

নির্দিষ্ট বিরতিতে আইনের সংসদীয় পর্যালোচনা

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যাপক পর্যালোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সফল উদ্যোগগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে তথ্য অধিকার আইনের উন্নয়ন নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি আইনে তথ্য প্রকাশের যে নীতি সংরক্ষিত রয়েছে তার প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন এবং আইনের আওতাধীনের দায়িত্ব পালনকে পুনর্বিবেচনা করতে কর্মকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জ্যামাইকাতে ‘তথ্য স্বাধীনতা আইন ২০০২’ বাস্তবায়নের প্রথম দুই বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা করতে একটি সংসদীয় কমিটি গঠনের বিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০৪ সালের শেষের দিকে এ কমিটি গঠিত হয়েছিল। এ কমিটি স্থানীয় কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজসহ আইন ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে এ আইন সংক্রান্ত বক্তব্য গ্রহণ করে। আইনটির খসড়া প্রণয়নে ঘাটতি এবং কতিপয় বাস্তব সমস্যা এসব বক্তব্যের মাধ্যমে উঠে আসে।

এমনকি, আইনে উল্লিখিত না থাকলেও নির্দিষ্ট সময় পর পর সংসদীয় পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা সরকারের একটি নিয়মিত কাজ। এ কমিটি তথ্য অধিকার আইনটি কতটা সফলতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা

যাচাই করবে। আইন বাস্তবায়ন বা আইন সংস্কারের সাথে জড়িত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও আইনের কার্যকরতা পরিমাপের জন্য দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় 'তথ্য স্বাধীনতা আইন' পাশের প্রায় ২০ বছর পর এর পর্যালোচনা করেছিল 'সিনেট লিগ্যাল অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল লেজিসলেশান কমিটি'।[৪৬] পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়ার আইন সংস্কার কমিশনগুলোও 'তথ্য স্বাধীনতা আইন' পর্যালোচনা এবং আইনের উন্নয়নে ১৫০টিরও বেশি সুপারিশ প্রকাশ করে।[৪৭] সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় ন্যায়পাল যিনি এ আইনের অধীনের অভিযোগ নিয়ে কাজ করেন তিনিও 'জাতীয় তথ্য কমিশনার' প্রতিষ্ঠার পরামর্শ প্রদানসহ আইন বাস্তবায়ন কার্যক্রমে উন্নয়ন সাধনের জন্য বেশকিছু সুপারিশ প্রদান করেছেন।[৪৮] কানাডা সরকার তথ্য প্রাপ্তি আইনের বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য ২০০২ সালে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে।[৪৯] ২০০৫ সালে জনগণের অংশগ্রহণে বেশ কয়েকটি পরামর্শ সভা করার পর কানাডার তথ্য কমিশনার অনেকগুলো সুপারিশ আইন পর্যালোচনার জন্য গঠিত সিনেট কমিটিতে পাঠান।[৫০] এরপর 'ফেডারেল অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি অ্যাক্ট' এর মাধ্যমে সরকার 'তথ্য প্রাপ্তি আইন' এ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে।[৫১] উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো হচ্ছে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারীদের সাহায্য করার জন্য দায়িত্ব বৃদ্ধি (২০০৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর), এবং সংসদ ও প্রধান প্রধান করপোরেশন ও তাদের নিজস্ব মালিকানাধীন কোম্পানিসহ প্রায় আরও ৭০টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন।[৫২] গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এ আইনের যে কোনো ধরনের পর্যালোচনা মূলত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং জনগণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি আরও সহজ লভ্য করার উদ্দেশ্যে করতে হবে।

বাংলাদেশে তথ্য পাওয়ার পদ্ধতি

- ▲ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্যের জন্য নির্ধারিত ফরমে বা সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে। ই-মেইলেও তথ্যের জন্য আবেদন করা যাবে;
- ▲ আবেদনপত্র জমা নেওয়ার ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করবেন। তবে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করতে যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা থাকে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন;
- ▲ তথ্য প্রদানে ফি ও তথ্যের মূল্যের প্রয়োজন হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্র জমা নেওয়ার পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে তা পরিশোধ করার জন্য জানাবেন;
- ▲ তথ্য দিতে না পারলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার কারণ উল্লেখ করে আবেদনকারীকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে জানাবেন; এবং
- ▲ ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে তথ্য পেতে যে ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেবেন।

উল্লেখ্য, অনুরোধকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।

আবেদনপত্রে যেসব বিষয় থাকতে হবে

১.১ আবেদনকারীর নাম:
১.২ পিতার নাম:
১.৩ মাতার নাম:
১.৪ বর্তমান ঠিকানা:
১.৫ স্থায়ী ঠিকানা:
১.৬ ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে):
১.৭ পেশা:
২. কী ধরনের তথ্য প্রয়োজন:
৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/ সিডি অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি):
৪. তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা:
৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা:
৬. তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা:
৭. আবেদনের তারিখ:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:

উপসংহার

স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে নিবিড় বিধিসংবলিত তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন। তবে আইন বাস্তবায়নে শক্তিশালী রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং দীর্ঘদিনের গোপনীয়তার সংস্কৃতি মূলোৎপাটনে সম্পদ ও কৌশল বিনিয়োগ না করলে আইনের কার্যকরতা চরম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে।

তথ্য প্রদান এবং তথ্যের দাবি উত্থাপন উভয়ই তথ্য প্রাপ্তি সমীকরণের প্রয়োজনীয় অংশ। তথ্য প্রদান কার্যক্রম কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সাথে করার নিশ্চয়তা বিধানের প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারের। কর্মকর্তারা যদি তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হন তাহলে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনগুলোর প্রক্রিয়াকরণ দুর্বলভাবে হবে। যদি সঠিক উপায়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা না হয় তাহলে আবেদনগুলোর প্রক্রিয়াকরণ ধীরগতিতে হবে। অন্যদিকে যদি তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ গ্রহণ ও তার মীমাংসা পর্যবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আবেদন হারিয়ে যেতে পারে অথবা আদৌ সেগুলো নিয়ে কাজ নাও হতে পারে। যেকোনো নতুন আইন বাস্তবায়নের শুরুতেই উল্লিখিত বিষয় নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। আইন বাস্তবায়নের শুরুতেই সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একটি নতুন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য দরকার হবে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আর্থিক প্রতিশ্রুতি এবং কর্মীর অঙ্গীকার। বাস্তবায়ন কার্যক্রমের শুরুতে যাবতীয় ব্যবস্থায় যথাযথ বিনিয়োগ পরবর্তীতে এর সুফল বয়ে আনবে। স্বচ্ছতা সুশাসন প্রক্রিয়াকে সুশৃঙ্খল করে, প্রশাসনিক দক্ষতার উন্নয়ন করে, দুর্নীতি হ্রাস করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বৈদেশিক বিনিয়োগে সহায়ক হিসেবে কাজ করে এবং উন্নয়নমূলক উদ্যোগে সাফল্য নিয়ে আসে। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান আর্থিক লাভ রয়েছে। সার্বিকভাবে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এগুলোর অবদানও অপরিসীম।

তথ্যসূত্র

[১] *দ্যা ডেইলি ষ্টার, ৮ আগস্ট ২০০৯।* প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য কমিশনারদের সাথে সাক্ষাতের সময় এ কথা বলেন।

[২] থিপ্যানিয়ান, টি. (২০০২) *ইমপ্লিমেন্টেশন অব ফ্রিডম অব ইনফরমেশন লেজিসলেশন ইন সাউথ আফ্রিকা*, সিএইচআরআই (অপ্রকাশিত) পৃ ৯।

[৩] সিএইচআরআই এর সাথে ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগোর ফ্রিডম অব ইনফরমেশন ইউনিটের ই-মেইল যোগাযোগ। বিস্তারিত জানতে লগ অন করুন:http://www.foia.gov.tt।

[৪] *তথ্য অধিকার আইন ২০০৫* (ভারত), এস. ১৮(১)(এফ)।

[৫] ইফতেখারুজ্জামান, 'চাই তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯।

[৬] অস্ট্রেলিয়ার আইন সংস্কার কমিশন, (১৯৯৫) *ওপেন গভর্নমেন্ট: এ রিভিউ অব দ্যা ফেডারেল ফ্রিডম অব ইনফরমেশন আইন ১৯৮২*, এএলআরসি ৭৭, অনুচ্ছেদ ৪.১৩, http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/77/4.html।

[৭] স্নেল. আর. (২০০১) 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমপ্লায়েন্স: ইভালুয়েটিং দ্যা ইফেকটিভনেস অব ফ্রিডম অব ইনফরমেশন', *ফ্রিডম অব ইনফরমেশন রিভিউ*, ৯৩ নং, পৃ ২৮।

[৮] *তথ্য প্রাপ্তি আইন* ১৯৮৩ (কানাডা), এস. ৬৭.১; উদাহরণ হিসেবে আরও দেখুন, *তথ্য প্রাপ্তি আইন* ২০০২ (জ্যামাইকা), এস. ৩৪; *প্রমোশন অব একসেস টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট* ২০০০ (দক্ষিণ আফ্রিকা), এস. ৯০; *তথ্য স্বাধীনতা আইন* ২০০০ (যুক্তরাজ্য), এস. ৭৭।

[৯] তথ্য প্রাপ্তি পর্যালোচনা টাস্কফোর্স, (২০০২) *একসেস টু ইনফরমেশন: মেকিং ইট ওয়ার্ক ফর কানাডিয়ানস্*, পৃ. ১৫৭-১৬৫, http://www.atirtf-geai.gc.ca।

[১০] কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ, (২০০১) *হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পোভারটি ইরাডিকেশন: এ তালিসমান ফর দ্যা কমনওয়েলথ*, নয়াদিল্লি, সিএইচআরআই, পৃ ৯৬।

[১১] *দ্যা জ্যামাইকান অবজারভার*, 'ইনফরমেশন এ্যাক্ট পুশেস গভর্নমেন্ট ওয়ারকার্স ইনটু দ্যা ক্লাশরুম' শিরোনামে প্রতিবেদন হিসেবে ১৮ জানুয়ারি ২০০৩ প্রকাশিত, http://www.jamaicaobserver.com।

[১২] তথ্য প্রাপ্তি পর্যালোচনা টাস্কফোর্স, প্রাগুক্ত, পৃ ১৬৯।

[১৩] দেখুন: দিল্লি *তথ্য অধিকার আইন ২০০১*; মহারাষ্ট্র *তথ্য অধিকার আইন ২০০২*।

[১৪] কিটোরা, এম. (২০০২) *'লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কস্ এনফোরসিং রাইট টু ইনফরমেশন: রাইট টু ইনফরমেশন ইন বাংলাদেশ'*, সিএইচআরআই (অপ্রকাশিত), পৃ ২।

[১৫] পদমোজান, পি. (২০০৩) *'মালয়েশিয়া: এ স্ট্যাটাস রিপোর্ট অন রাইট টু ইনফরমেশন, এপ্রিল ২০০৩'*, সিএইচআরআই (অপ্রকাশিত), পৃ ৯।

[১৬] ধল, এম. (২০০৩) *'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন ইন দ্যা ক্যারিবিয়ান'*, পৃ. ২৯, সিএইচআরআই (অপ্রকাশিত)।

[১৭] প্রাইভেসি কমিশনারের অফিস, (১৯৯৮) 'সরি, উই কান্ট টেল ইউ দ্যাট', *প্রাইভেট ওয়ার্ড*, ২৩ মার্চ সংখ্যা http://www.humanrightsinitiative.org।

[১৮] *সাক্ষ্য আইন ১৮৭২* (ভারত), এসএস. ১২৩ ও ১২৪।

[১৯] ২০০১ যুক্তরাজ্যে তথ্য স্বাধীনতার জন্য প্রচারণা *দ্যা মিনিস্টারিয়াল ভেটো ওভারসিস: ফারদার এভিডেন্স টু দ্যা জাস্টিস ওয়ান কমিটি অন দ্যা ফ্রিডম অব ইনফরমেশন (স্কটল্যান্ড) বিল*, http://www.cfoi.org.uk/pdf/vetopaper.pdf।

[২০] *তথ্য উন্মোচনকারী নিরাপত্তা আইন* ২০০০ (দক্ষিণ আফ্রিকা)।

[২১] *জনস্বার্থ উন্মোচন আইন* ১৯৯৮ (যুক্তরাজ্য)।

[২২] ড্রু. কে. (২০০৩) *'হুইসেল ব্লোইং অ্যান্ড করাপশন: অ্যান ইনিশিয়াল অ্যান্ড কমপারেটিভ রিভিউ'*, পাবলিক সার্ভিসেস ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ ইউনিট, পৃ ৪, http://www.psiru.org।

[২৩] *দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান* ১৯৯৬, এস. ১৬০(৭)।

[২৪] *স্থানীয় সরকার দাপ্তরিক তথ্য ও সভা আইন* ১৯৮৭ (নিউজিল্যান্ড)।

[২৫] তথ্য প্রাপ্তি ইউনিট (২০০৪), *গাইডলাইনস্ অন দ্যা ডিসচার্জ অব ফাংশনস্ আন্ডার দি অ্যাক্ট বাই পাবলিক অফিসার্স:* জ্যামাইকা, পৃ ৫, http://www.ati.gov.jm/directorsfirstquarterlyreport.pdf।

[২৬] যুক্তরাজ্যের তথ্য কমিশনার এর ওয়েবসাইট দেখুন: http://www.informationcommissioner.gov.uk।

[২৭] এই নির্দেশিকাটি যখন আমরা প্রথম প্রকাশ করি তখন CAIRS নামের তথ্য প্রাপ্তি ডেটাবেজটি কাজ করেছিল। ২০০৮ মে মাসে একটি প্রতিবেদনে জানা যায় যে, কানাডার কেন্দ্রীয় সরকার এই ডেটাবেজটি ধ্বংস করে ফেলেছে। দেখুন http://www.cbc.ca/canada/story/2008/05/02caires.html.

[২৮] কুইন্সল্যান্ডের তথ্য কমিশনার এর ওয়েবসাইট, দেখুন: http://www.infocomm.qld.gov.au।

[২৯] স্কটল্যান্ডের তথ্য কমিশনার এর ওয়েবসাইট, দেখুন: http://www.itspublicknowledge.info/appealsdecisions/decidsions/index.phpu।

[৩০] পরিবীক্ষণের টুল ডাউনলোড করা যেতে পারে এই ওয়েবসাইট থেকে http://www.gad.gov.uk।

[৩১] এক্সপ্রেস নিউজ সার্ভিস, (২০০৩) 'ফার্স্ট দিল্লী হেড রোলস্‌ ইন তাজ ডার্ট: এনভায়রনমেন্ট সেক্রেটারি টোলড টু গো অ্যান্ড রেস্ট', *ইনডিয়ান এক্সপ্রেস,* ১২ সেপ্টেম্বর, http://www.expressindia.com।

[৩২] *তথ্য অধিকার আইন ২০০৫* (ভারত), এস. ৪(১); *তথ্য স্বাধীনতা অধ্যাদেশ ২০০২* (পাকিস্তান), *তথ্য অধিকার আইন ২০০৯* (বাংলাদেশ) এস. ৬।

[৩৩] *তথ্য স্বাধীনতা আইন* ২০০০ (যুক্তরাজ্য) এর এস. ৪৬ এর উন্নয়ন সাপেক্ষে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: http://www.pro.gov.uk/recordsmanagement/freedomofinformation.htm।

[৩৪] বিশ্ব ব্যাংক (২০০২), *ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০২: বিল্ডিং ইনস্টিটিউশনস ফর মার্কেটস,* ওয়াশিংটন, ওইউপি, পৃ ১৬৪।

[৩৫] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন: মিস্ত্রি, জে এন্ড রডরিগজ, সি. (২০০৫) 'ই-গভর্নেন্স ইন দ্যা প্যাসিফিক আইল্যান্ডস: এনট্রেনসিং গুড গভর্নেন্স অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বাই প্রোমোটিং আইসিটি স্ট্যাটেজিস বেজড অন দ্যা রাইট টু ইনফরমেশন', শাসন ও উন্নয়নের ওপর আইআইডিএস এর সম্মেলনে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপিত, ১-৪ ডিসেম্বর ২০০৫, ইউনিভার্সিটি অব দ্যা সাউথ প্যাসিফিক, শুভা, ফিজি।

[৩৬] বিশ্ব ব্যাংক (২০০৩), *ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৪: মেকিং সার্ভিসেস ওয়ার্ক ফর পুওর পিপল,* ওয়াশিংটন, পৃ. ৬২-৬৩ ও ১৮৫।

[৩৭] ভাটনগর, এস. (২০০৩) *'ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড করাপশান: ডাজ ই-গভর্নমেন্ট হেলপ',* সিএইচআরআই (অপ্রকাশিত), পৃ ২।

[৩৮] ভাটনগর, এস. (২০০৩) *'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ করাপশান: হাউ ডাজ ই-গভর্নমেন্ট হেলপ',* http://www.worldbank.org।

[৩৯] ইফতেখারুজ্জামান, *'টুওয়ার্ডস পিপলস্‌ রাইট টু ইনফরমেশন ইন বাংলাদেশ: হাই এক্সপেক্টেশন, টেনটেটিভ প্রগ্রেস, দ্যা ওয়ে ফরওয়ার্ড',* শীর্ষক প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ এ তথ্য অধিকার ফোরাম, বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত।

[৪০] দেখুন: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী ইশতেহার, *দ্যা ডেইলি স্টার,* ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮

[৪১] হাউজ অব কমনস্‌ কনস্টিটিউশনাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি, *'ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট ২০০০- প্রোগ্রেস টুওয়ার্ডস ইমপ্লিমেন্টেশন'* ভলিউম ১, নভেম্বর ২০০৪, http://www.dca.gov.uk/foi/bkgrndact.htm#top. এলাসডায়ার রবার্টস্‌, ব্ল্যাকড আউট: গভর্নমেন্ট সিক্রেসি ইন দি ইনফরমেশন এইজ (নিউ ইয়র্ক: ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬)

[৪২] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় বাংলাদেশে এনজিও খাতের তথ্য প্রকাশে অনীহা এবং ব্যাপক গোপনীয়তা বজায় রাখার বিষয়টি উঠে এসেছে। দেখুন: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *'বাংলাদেশে এনজিও খাতের শাসন ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জসমূহ'* ২০০৭।

[৪৩] দেখুন: *কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্‌ ইনিশিয়েটিভ, ইমপ্লিমেন্টিং একসেস টু ইনফরমেশন: এ প্র্যাকটিক্যাল গাইড ফর অপারেশনালাইজিং একসেস টু ইনফরমেশন ল'জ,* পুনঃসম্পাদনা, সিএইচআরআই, নয়াদিল্লী, ২০০৮।

[৪৪] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সারাদেশের ৩৬টি এলাকায় তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক কার্যক্রম পরিচালনা করছে যার মাধ্যমে ইতিবাচক ও দৃশ্যমান পরিবর্তন আনা সম্ভব হচ্ছে। দেখুন: কলিন নক্স, *'ডলিং উইথ সেকটোরাল করাপশন ইন বাংলাদেশ: ডেভেলপিং সিটিজেনস্‌ ইনভলভমেন্ট'* ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, www.interscience.wiley.com

[৪৫] সাবেক তথ্য কমিশনার জন ডব্লিউ গ্রেস এর উদ্ধৃতি রিড, জে. (২০০৩) এর *বার্ষিক প্রতিবেদনে: তথ্য কমিশনার ২০০১-২০০২,* গণপূর্ত ও সরকারি চাকুরি মন্ত্রণালয়, কানাডা, পৃ ৩২।

[৪৬] সিনেট লিগ্যাল অ্যান্ড কনস্টিটিউশনাল লেজিসলেশন কমিটি (২০০১), *ইনকয়্যারি ইনটু ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যামেন্ডমেন্ট (ওপেন গভর্নমেন্ট) বিল ২০০০,* পার্লামেন্ট অব দ্যা কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া, http://www.humanrightsinitiative।

[৪৭] অস্ট্রেলিয়ান ল রিফর্ম কমিশন (১৯৯৫) ওপেন গভর্নমেন্ট: এ রিভিউ অব দ্যা ফেডারেল ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট ১৯৮২, http://www.austlii/edu.au/au।

[৪৮] কমনওয়েলথ ওমবুডসম্যান (২০০৬) *স্ক্রুটিনাইজিং গভর্নমেন্ট - অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব দ্যা ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট ১৯৮২ ইন অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট এজেন্সিস,* মার্চ ২০০৬। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন http://www.comb.gov.au।

[৪৯] দেখুন http://www.atirtf-geai.gc.ca।

[৫০] কানাডার তথ্য কমিশনার (২০০৫) *রেকোমেন্ডেড অ্যামেন্ডমেন্টস টু দি এটিআই আইন ১৯৮৩,* http://www.infocom.gc.ca।

[৫১] *ফেডারেল অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি আইন* ২০০৬ (কানাডা), http://laws.justice.gc.ca।

[৫২] কানাডার তথ্য কমিশনার (২০০৮), *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৭-২০০৮,* http://www.infocom.gc.ca।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, এপ্রিল ৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই এপ্রিল, ২০০৯/২৩শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৫ই এপ্রিল, ২০০৯ (২২শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:

২০০৯ সনের ২০ নং আইন

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ;
এবং যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং

যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং

যেহেতু সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন। – (১) এই আইন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের –

(ক) ধারা ৮, ২৪ এবং ২৫ ব্যতীত অন্যান্য ধারা ২০ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) ৮, ২৪ এবং ২৫ ধারা ১লা জুলাই, ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা। – বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, এই আইনে –

(ক) "আপিল কর্তৃপক্ষ" অর্থ –

(অ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা

(আ) কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকিলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান;

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ –

(অ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা;

(আ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কার্যবিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়;

(ই) কোন আইন দ্বারা বা উহার অধীন গঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঈ) সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বা সরকারী তহবিল হইতে সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(উ) বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) সরকারের পক্ষে অথবা সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সরকারী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; বা

(ঋ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) "কর্মকর্তা" অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "তথ্য প্রদান ইউনিট" অর্থ –

(অ) সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সহিত সংযুক্ত বা অধীনস্থ কোন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়,

(আ) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়;

(ঙ) "তথ্য কমিশন" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন;

(চ) "তথ্য" অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ছ) "তথ্য অধিকার" অর্থ কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার;

(জ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(ঝ) "তৃতীয় পক্ষ" অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত জড়িত অন্য কোন পক্ষ;

(ঞ) "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা;

(ট) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(ঠ) "প্রবিধান" অর্থ ধারা ৩৪ এর অধীন প্রণীত কোন প্রবিধান;

(ড) "বাছাই কমিটি" অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(ঢ) "বিধি" অর্থ ধারা ৩৩ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি।

৩। আইনের প্রাধান্য। – প্রচলিত অন্য কোন আইনের–

(ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা ক্ষুন্ন হইবে না; এবং

(খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাপ্তি

৪। তথ্য অধিকার। – এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫। তথ্য সংরক্ষণ।

(১) এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করিয়া যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যেই সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে।

(৩) তথ্য কমিশন, প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে।

৬। তথ্য প্রকাশ।

(১) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্য হয়, এইরূপে সূচিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করিতে বা উহার সহজলভ্যতাকে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে না।

(৩) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:

(ক) কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি;

(খ) কর্তৃপক্ষের সকল নিয়ম-কানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়্যাল, ইত্যাদির তালিকাসহ উহার নিকট রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস;

(গ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন উহার বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তাহার সহিত কোন প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে সেই সকল শর্তের বিবরণ;

(ঘ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।

(৪) কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোন নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবে এবং প্রয়োজনে, ঐ সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করিতে হইবে এবং উহার কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখিতে হইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করিতে হইবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করিবে।

(৮) তথ্য কমিশন, প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে।

৭। কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়।– এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা:

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ("Intellectual Property Right") সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা:

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তনাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্যঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ।

(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চাহিয়া লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথা:

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে উহার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী; এবং

(ঈ) কোন্ পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী উহার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

(৩) এই ধারার অধীন তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত ফরমেটে হইতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হইলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হইলে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করিয়া সাদা কাগজে বা, ক্ষেত্রমত, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফিস এবং, প্রয়োজনে, তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে এবং, ক্ষেত্রমত, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-শ্রেণীকে কিংবা যে কোন শ্রেণীর তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে, বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হইবে উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

৯। তথ্য প্রদান পদ্ধতি।

(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হইলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি উহা অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হইতে মুক্তি সম্পর্কিত হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করিতে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকিলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিবার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের প্রকৃত ব্যয় যেমন–তথ্যের মুদ্রিত মূল্য ইলেক্ট্রনিক ফরমেট এর মূল্য কিংবা ফটোকপি বা প্রিন্ট আউট সংক্রান্ত যে ব্যয় হইবে উহা হইতে অধিক মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৮) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হইলে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কতৃর্ক সরবরাহ করা হইয়াছে

কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষ উহা গোপনীয় তথ্য হিসাবে গণ্য করিয়াছে সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে উহার লিখিত বা মৌখিক মতামত চাহিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এইরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোন মতামত প্রদান করিলে উহা বিবেচনায় লইয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৯) ধারা ৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(১০) কোন ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ জানাইবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং পরিদর্শনের জন্য যে ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তাহা প্রদান করাও এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১০। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

(১) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, এই আইন জারীর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পর প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ, উক্তরূপ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন কর্তৃপক্ষ উহার কোন কার্যালয় সৃষ্টি করিলে, উক্তরূপ কার্যালয় সৃষ্টির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত উক্ত কার্যালয় তথা নবসৃষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(৪) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা উক্তরূপ নিয়োগ প্রদানের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৫) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যে কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাহিতে পারিবেন এবং কোন কর্মকর্তার নিকট হইতে এইরূপ সহায়তা চাওয়া হইলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উপ-ধারা (৫) এর অধীন অন্য কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাওয়া হইলে এবং এইরূপ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য আইনের কোন বিধান লংঘিত হইলে সেইক্ষেত্রে এই আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

১১। তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা।

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে তথ্য কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পরিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কমিশন, প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

১২। তথ্য কমিশনের গঠন।

(১) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য ২ (দুই) জন তথ্য কমিশনার সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠিত হইবে, যাহাদের মধ্যে অন্যূন ১ (এক) জন মহিলা হইবেন।

(২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) তথ্য কমিশনের কোন পদে শূন্যতা বা উহা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে তথ্য কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৩। তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।

(১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে কোন অভিযোগ দায়ের করিলে তথ্য কমিশন, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত অভিযোগ গ্রহণ, উহার অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করিতে পরিবে, যথা:

(ক) কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করা;

(খ) কোন তথ্য চাহিদা প্রত্যাখ্যাত হইলে;

(গ) তথ্যের জন্য অনুরোধ করিয়া, এই আইনে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন জবাব বা তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;

(ঘ) কোন তথ্যের এমন অংকের মূল্য দাবী করা হইলে, বা প্রদানে বাধ্য করা হইলে, যাহা তাহার বিবেচনায় যৌক্তিক নয়;

(ঙ) অনুরোধের প্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হইলে বা যে তথ্য প্রদান করা হইয়াছে উহা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিয়া মনে হইলে;

(চ) এই আইনের অধীন তথ্যের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন বা তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।

(২) তথ্য কমিশন স্বপ্রণোদিত হইয়া অথবা কোন অভিযোগের ভিত্তিতে এই আইনের অধীন উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নলিখিত বিষয়ে Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারও এই ধারার অধীন সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা:

(ক) কোন ব্যক্তিকে তথ্য কমিশনে হাজির করিবার জন্য সমন জারী করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা;

(খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) কোন অফিসের কোন তথ্য আনয়ন করা;

(ঙ) কোন সাক্ষী বা দলিল তলব করিয়া সমন জারী করা; এবং

(চ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

(৪) অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তথ্য কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার কোন কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য সরেজমিনে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৫) তথ্য কমিশনের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুরোধের পদ্ধতি নির্ধারণ ও, ক্ষেত্রমত, তথ্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ;

(গ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিমালা এবং নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(ঘ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা এবং উহার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করিয়া উহা দূরীকরণার্থে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(চ) তথ্য অধিকার বিষয়ক চুক্তিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলাদির ওপর গবেষণা করা এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ছ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের সহিত বিদ্যমান আইনের সাদৃশ্যতা পরীক্ষা করা এবং বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে উহা দূরীকরণার্থে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(জ) তথ্য অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক দলিল অনুসমর্থন বা উহাতে স্বাক্ষর প্রদানে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঝ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণা করা এবং শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানকে উক্তরূপ গবেষণা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান;

(ঞ) সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচার এবং প্রকাশনা ও অন্যান্য উপায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ট) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মরত সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(ড) তথ্য অধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং অনুরূপ অন্যবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার;

(ঢ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

(ণ) তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি ওয়েব পোর্টাল স্থাপন; এবং

(ত) তথ্য অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে অন্য কোন আইনে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করা।

১৪। বাছাই কমিটি।

(১) প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(গ) সংসদ কার্যকর থাকাকালীন অবস্থায় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি দলের একজন এবং বিরোধী দলের একজন সংসদ সদস্য;

(ঘ) সম্পাদকের যোগ্যতাসম্পন্ন সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত এমন অথবা গণমাধ্যমের সহিত সম্পর্কিত সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি।

(২) তথ্য মন্ত্রণালয় উপ-ধারা (১) এর অধীন বাছাই কমিটি গঠনে এবং উক্ত বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) অন্যূন ৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) বাছাই কমিটি, প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার নিয়োগের নিমিত্ত রাষ্ট্রপতির নিকট, সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ২ (দুই) জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে।

(৫) বাছাই কমিটিতে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বাছাই কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে, উহার কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৫। প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের নিয়োগ, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি।

(১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্যান্য তথ্য কমিশনারগণকে নিয়োগ করিবেন।

(২) ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক কোন ব্যক্তি প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগ লাভের বা অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

(৩) প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণ নিয়োগ লাভের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর কিংবা ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত, যেইটি আগে ঘটে, স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণ একই পদে পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, তবে কোন তথ্য কমিশনার প্রধান তথ্য কমিশনার পদে নিয়োগ লাভের অযোগ্য হইবেন না।

(৫) আইন, বিচার, সাংবাদিকতা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য, সমাজকর্ম, ব্যবস্থাপনা বা জনপ্রশাসনে ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণ, এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন।

(৬) প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৭) প্রধান তথ্য কমিশনারের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে প্রধান তথ্য কমিশনার তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত প্রধান তথ্য কমিশনার তাঁহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান তথ্য কমিশনার পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতম তথ্য কমিশনার প্রধান তথ্য কমিশনার পদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৬। প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের অপসারণ।

(১) সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত প্রদান তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনারকে অপসারণ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতি প্রধান তথ্য কমিশনার বা অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি তিনি–

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা

(খ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব বহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন; বা

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন; বা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

১৭। তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি। – প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা, ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি সরকার কতৃর্ক নির্ধারিত হইবে।

১৮। তথ্য কমিশনের সভা।

১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, তথ্য কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তথ্য কমিশনারগণের মধ্যে যিনি তথ্য কমিশনার হিসাবে জ্যেষ্ঠতম তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং তথ্য কমিশনারগণের মধ্যে যে কোন ১ (এক) জনের উপস্থিতিতে তথ্য কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) তথ্য কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্যান্য তথ্য কমিশনারগণের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
তথ্য কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৯। তথ্য কমিশন তহবিল।

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তথ্য কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) তথ্য কমিশন তহবিল এর পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধির বিধান সাপেক্ষে, তথ্য কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) তথ্য কমিশন তহবিল হইতে প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারগণের এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং তথ্য কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) তথ্য কমিশন তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:

(ক) সরকার কতৃর্ক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান;

(খ) সরকারের সম্মতিক্রমে কোন প্রতিষ্ঠান কতৃর্ক প্রদত্ত অনুদান।

২০। বাজেট। – তথ্য কমিশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ- বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে তথ্য কমিশনের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২১। তথ্য কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।

(১) সরকার প্রতি অর্থ-বৎসরে তথ্য কমিশনের ব্যয়ের জন্য, উহার চাহিদা বিবেচনায়, উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা তথ্য কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুন্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

২২। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।

(১) তথ্য কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তথ্য কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও তথ্য কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তথ্য কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং প্রধান তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারগণ বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

২৩। তথ্য কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

(১) তথ্য কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) এই আইনের অধীন তথ্য কমিশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) সরকার, তথ্য কমিশনের অনুরোধক্রমে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে কমিশনে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
আপিল নিষ্পত্তি, ইত্যাদি

৪ । আপিল নিষ্পত্তি, ইত্যাদি ।

(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হইলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার, বা ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্ত লাভ করিবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপিলকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপিল আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন আপিল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে—

(ক) আপিল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন; অথবা

(খ) তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে আপিল আবেদনটি খারিজ করিয়া দিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশিত হইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ধারা ৯ এর, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

২৫ । অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি, ইত্যাদি ।

(১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;

(খ) ধারা ২৪ এর অধীন প্রদত্ত আপিলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে;

(গ) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হইলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত বিষয়ে যে কোন সময় এবং দফা (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত বিষয়ে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযোগকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (২) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তথ্য কমিশন উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও অভিযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণে করণীয় কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বা করণীয় নয় এমন কার্য করিয়াছেন তাহা হইলে তথ্য কমিশন এই ধারার অধীন উক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর কিংবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হইলে প্রধান তথ্য কমিশনার উক্ত অভিযোগটি স্বয়ং অনুসন্ধান করিবেন অথবা অনুসন্ধানের জন্য অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত দায়িত্ব গ্রহণ বা প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান সম্পন্ন করিয়া প্রধান তথ্য কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের জন্য একটি সিদ্ধান্ত কার্যপত্র প্রস্তুত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত কার্যপত্র তথ্য কমিশনের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং তথ্য কমিশন উহার সভায় আলোচনাক্রমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৮) এই ধারায় উল্লিখিত কোন অভিযোগের অনুসন্ধানকালে যে কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় সেই কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে, তাহার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৯) কোন অভিযোগের বিষয়বস্তুর সহিত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকিলে তথ্য কমিশন উক্ত তৃতীয় পক্ষকেও বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(১০) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে, তবে, ক্ষেত্র বিশেষে, সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ বা তদন্ত সম্পাদন ইত্যাদি কারণে বর্ধিত সময়ের প্রয়োজন হইলে উক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পন্ন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা, বর্ধিত সময়সহ, কোনক্রমেই সর্বমোট ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের অধিক হইবে না।

(১১) এই ধারার অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা:

(ক) কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাহা এই আইনের বিধান মোতাবেক গ্রহণ করা প্রয়োজন, যথা:

(অ) অনুরোধকৃত তথ্য সুনির্দিষ্ট পন্থায় প্রদান;

(আ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ;

(ই) বিশেষ কোন তথ্য বা বিশেষ ধরনের তথ্যাবলী প্রকাশ;

(ঈ) তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের পালনীয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন;

(উ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণ;

(ঊ) কোন ক্ষতি বা অন্য কোন প্রকার দুর্ভোগের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান;

(খ) এই আইনে বর্ণিত কোন জরিমানা আরোপ করা;

(গ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা;

(ঘ) অভিযোগ খারিজ করা;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নূতনভাবে তথ্যের শ্রেণীবদ্ধকরণ;

(চ) তথ্যের প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাসকরণ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও সরবরাহ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে এই আইনের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান।

(১২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(১৩) তথ্য কমিশন ইহার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(১৪) তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তির অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৬। প্রতিনিধিত্ব। – কোন অভিযোগের পক্ষসমূহ তথ্য কমিশনের সামনে ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর মাধ্যমে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

২৭। জরিমানা, ইত্যাদি।

(১) কোন অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশনের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা–

(ক) কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপিল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন;

(খ) এই আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করিতে কিংবা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন;

(গ) অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপিল প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন;

(ঘ) যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা হইয়াছিল তাহা প্রদান না করিয়া ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করিয়াছেন;

(ঙ) কোন তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন–

তাহা হইলে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যের তারিখ হইতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০(পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ জরিমানা কোনক্রমেই ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জরিমানা আরোপের পূর্বে তথ্য কমিশন, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তাহার বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তিতে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কার্য করিয়া কোন কর্মকর্তা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তথ্য কমিশন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার এহেন কার্যকে অসদাচরণ গণ্য করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে গৃহীত সর্বশেষ ব্যবস্থা তথ্য কমিশনকে অবহিত করিবার জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীন পরিশোধযোগ্য কোন জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হইতে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে।

২৮। Limitation Act, 1908 এর প্রয়োগ। – এই আইনের অধীন আপিল বা অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে Limitation Act, 1908 (Act IX of 1908) এর বিধানাবলী, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

২৯। মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। – এই আইনের অধীন কৃত বা কৃত বলিয়া গণ্য কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে, এই আইনে উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের ব্যতীত, কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

৩০। তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন।

(১) প্রতি বৎসরের ৩১ মার্চ এর মধ্যে তথ্য কমিশন উহার পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যাবলী সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট বৎসরের নিম্নলিখিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকিবে, যথা:

(ক) কর্তৃপক্ষওয়ারী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত অনুরোধের সংখ্যা;

(খ) অনুরোধকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা এবং এই বিবরণ;

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিলের সংখ্যা এবং উক্ত আপিলের ফলাফল;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই আইনের অধীন সংগৃহীত উপযুক্ত মূল্যের পরিমাণ;

(চ) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ;

(ছ) নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পৃক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব;

(জ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা;

(ঝ) তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ;

(ঞ) তথ্য কমিশন কর্তৃক আরোপিত ও দন্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ও উহার বিবরণ;

(ট) তথ্য কমিশন কর্তৃক আরোপিত ও আদায়কৃত জরিমানার মোট পরিমাণ;

(ঠ) তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা ও প্রবিধানমালা;

(ড) তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব;

(ঢ) তথ্য কমিশনের বিবেচনায় প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন এইরূপ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়;

(ণ) এই আইনের বিধানাবলী প্রতিপালনে কোন কর্তৃপক্ষের অনীহা পরিলক্ষিত হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর রাষ্ট্রপতি উহা জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত প্রতিবেদন তথ্য কমিশন বিভিন্ন গণমাধ্যমে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রয়োজনে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৩১। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ। – এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে বা করিবার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বিবেচিত, কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি তথ্য কমিশন, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনারগণ বা তথ্য কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী, বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

৩২। কতিপয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নহে।

(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য দুর্নীতি বা মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার সহিত জড়িত থাকিলে উক্ত ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া, অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুরোধকারীকে উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৪) তফসিলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির প্রয়োজনে সরকার তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৩৩। বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা। – এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৪। প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা। – এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে তথ্য কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৫। অস্পষ্টতা দূরীকরণ। – এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা অপসারণ করিতে পারিবে।

৩৬। মূল পাঠ এবং ইংরেজি পাঠ। – এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজিতে অনুদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।

(১) এতদ্দ্বারা তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

(ধারা ৩২ দ্রষ্টব্য)

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ
(১)	(২)
১।	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)।
২।	ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স (ডিজিএফআই)।
৩।	প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিটসমূহ।
৪।	ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), বাংলাদেশ পুলিশ।
৫।	স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)।
৬।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল।
৭।	স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।
৮।	র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর গোয়েন্দা সেল।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট ২

তথ্য প্রাপ্তির ফরম

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ১, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

তফসিল

ফরম 'ক'
[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম ঃ............................

পিতার নাম ঃ............................

মাতার নাম ঃ............................

বর্তমান ঠিকানা ঃ............................

স্থায়ী ঠিকানা ঃ............................

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ............................

পেশা ঃ............................

২। কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ............................

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ লিখিত/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) ঃ............................

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ............................

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ............................

৬। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা ঃ............................

৭। আবেদনের তারিখ ঃ............................

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম 'খ'

[বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর ঃ তারিখ ঃ-------------------

প্রতি

আবেদনকারীর নাম ঃ..

ঠিকানা ঃ...

বিষয় ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ------------------------- তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথা ঃ-

১। ....
....।

২। ....
.... ।

৩। ....
.... ।

(----------------------)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ঃ

পদবী ঃ

দাপ্তরিক সীল

ফরম ‘গ’

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]
আপিল আবেদন

১। আপিলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ..

২। আপিলের তারিখ ঃ..

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ ....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ..

৫। আপিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ..

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ..

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ..

৮। আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ..

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপিল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপিলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ..

আপিলকারীর স্বাক্ষর

ফরম ‘ঘ’

[বিধি ৮ দ্রষ্টব্য]
তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য উহার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হইবে, যথাঃ

টেবিল

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নক্‌শা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবু ইউসুফ (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট ৩

বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট : www.infocom.govt.bd

পরিশিষ্ট ৪

তথ্য কমিশন কুইন্সল্যান্ড এর ওয়েব সাইট :

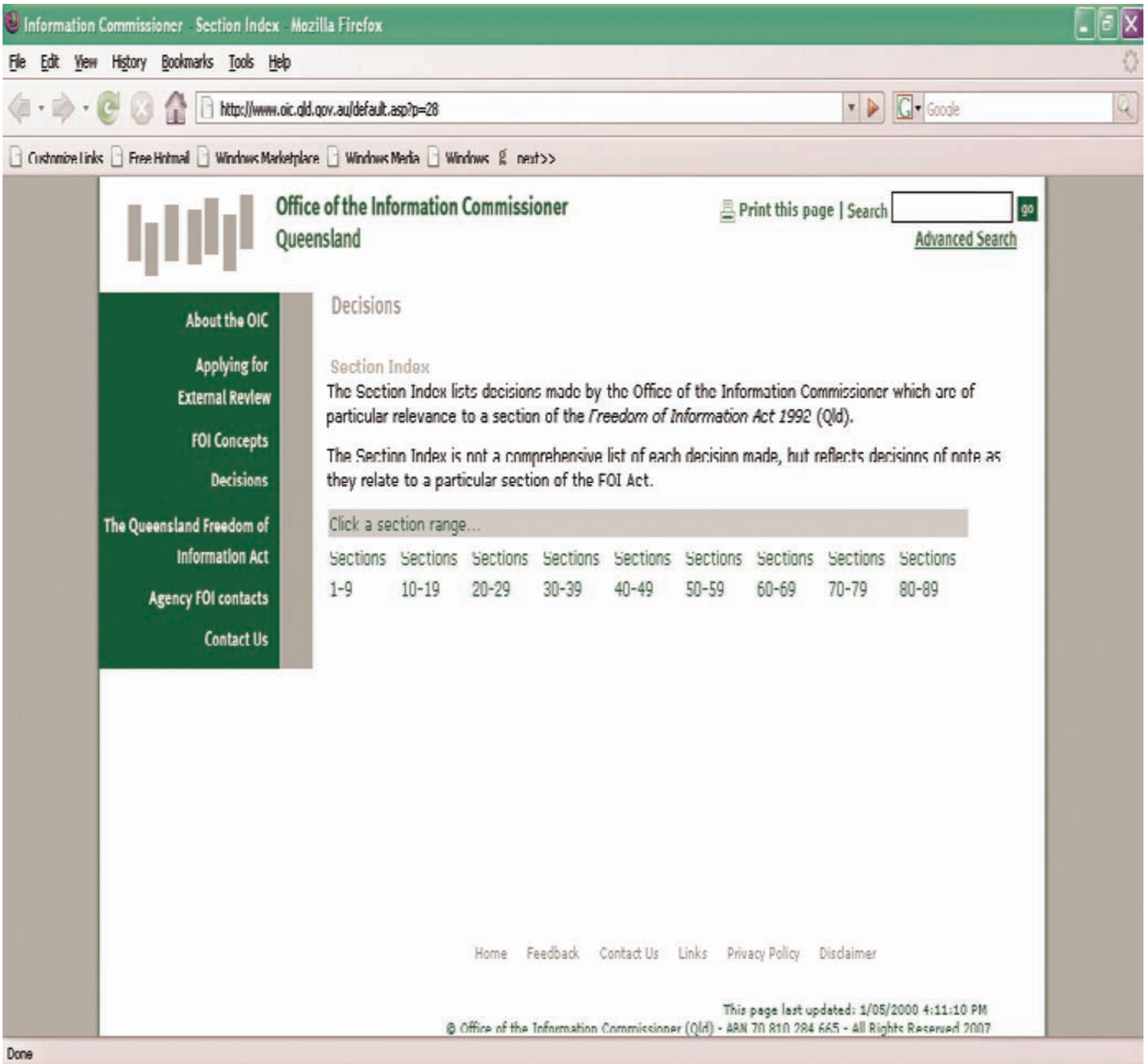

প্রয়োজনীয় লিংক

আন্তর্জাতিক

- কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ http://www.humanrightsinitiative.org
- আর্টিকেল ১৯ http://www.article19.org
- freedominfo.org http://www.freedominfo.org
- এফওআইএ নেট http://www.foiadvocates.net
- ইন্টারন্যাশনাল রেকর্ডস ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্ট http://www.irmt.org
- ওপেন সোসাইটি জাসটিস ইনিশিয়েটিভ http://www.justiceinitiative.org
- ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এক্সচেঞ্জ http://www.ifex.org
- ইউরোপিয়ান ওমবুডস্ম্যান হোমপেজ http://www.ombudsman.europa.cu/home/en/default.htm
- এক্সেস ইনফো ইউরোপ http://www.acess-info
- ডিপার্টমেন্ট অব প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড ক্যাবিনেট (অস্ট্রেলিয়া) http://www.pmc.gov.au/foi/index.cfm
- ইনফরমেশন কমিশনার অব কুইন্সল্যান্ড (অস্ট্রেলিয়া) http://www.infocomm.qld.gov.au
- ইনফরমেশন কমিশনার অব কানাডা (কানাডা) http://www.infocom.gc.ca
- গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া রাইট টু ইনফরমেশন সাইট (ইন্ডিয়া) http://www.rightloinformation.gov.in
- সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইনফরমেশন কমিশন (ইন্ডিয়া) http://www.cic.gov.in
- রাইট টু ইনফরমেশন ব্লগস্পট (ইন্ডিয়া) http://www.indiarti.blogspot.com
- এক্সেস টু ইনফরমেশন ইউনিট (জ্যামাইকা) http://www.jis.gov.jm/special_sections/ati/default.html
- জ্যামাইকান্স ফর জাসটিস (জ্যামাইকা) http://www.jamaicansforjustice.org
- অফিস অব দি প্রাইভেসি কমিশনার (নিউজিল্যান্ড) http://www.privacy.org.nz
- ওপেন ডেমোক্রেসি অ্যাডভাইস সেন্টার (সাউথ আফ্রিকা) http://www.opendemocracy.org.za
- ফ্রিডম অব ইনফরমেশন ওয়েবসাইট (ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্যাগো) http://www.foia.gov.tt
- স্কটিশ ইনফরমেশন কমিশন (স্কটল্যান্ড) http://www.itspublicknowledge.info
- ইউকে ইনফরমেশন কমিশন (ইউনাইটেড কিংডম) http://www.informationcommissioner.gov.uk
- মিনিস্ট্রি অব জাসটিস (ইউনাইটেড কিংডম) http://www.justice.gov.uk/whatwedo/freedomofinformation.html
- ক্যাম্পেইন ফর ফ্রিডম অব ইনফরমেশন (ইউনাইটেড কিংডম) http://www.cfoi.org.uk
- অফিস অব দ্যা ওমবুডস্ম্যান, অফিসিয়াল ইনফরমেশন কমপ্লেইন্টস (নিউজিল্যান্ড) http://www.omlbudsmen.parliament.nz/internal.asp.cat=100017
- গভর্নমেন্ট অব রিপাবলিক অব ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্যাগো http://www.foia.gov.tt
- কেম্যান আইল্যান্ডস্ ফ্রিডম অব ইনফরমেশন http://www.foi.gov.ky/portal/page
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল http://www.transparency.org

জাতীয়

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার http://www.bangladesh.gov.bd/index.php
- তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার http://www.moi.gov.bd
- তথ্য কমিশন http://www.infocom.gov.bd
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ http://www.ti-bangladesh.org
- রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ http://www.rib-bangladesh.org
- মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন http://www.mannsherjonno.org
- নাগরিক উদ্যোগ http://www. nuhr.org
- ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক-ডি.নেট http://www.dnet-bangladesh.org
- বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন http://www.bnnrc.net

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) একটি স্বাধীন ও নির্দলীয় আন্তর্জাতিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে মানবাধিকারের বাস্তবসম্মত অর্জন নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৮৭ সালে কমনওয়েলথভুক্ত কিছু পেশাজীবী সংস্থা মানবাধিকার উন্নয়নে কাজ করার লক্ষ্যে সিএইচআরআই গঠন করে।

সিএইচআরআই এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কমনওয়েলথ হারারে নীতি, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্যান্য মানবাধিকার সনদ, দলিল এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে মানবাধিকার সমর্থনকারী অভ্যন্তরীণ সনদ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং এসবের যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করা।

সিএইচআরআই বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সাময়িক অনুসন্ধানের মাধ্যমে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে মানবাধিকারের অগ্রগতি এবং বাধাসমূহের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রতিরোধের উপায় এবং পদ্ধতি সমর্থনের ক্ষেত্রে সিএইচআরআই কমনওয়েলথ সচিবালয়, সদস্য রাষ্ট্র এবং সুশীল সমাজভুক্ত সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করে। একযোগে নীতি সংলাপ, তুলনামূলক গবেষণা, প্রচারণা এবং নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে প্রধান ইস্যুগুলোর ব্যাপারে সিএইচআরআই অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

সিএইচআরআই এর উদ্যোক্তা সংস্থাগুলোর বিভিন্নতার কারণে এর জাতীয় উপস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সম্ভব হয়েছে। এসব পেশাদাররা তাদের কাজের মধ্যে মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সরকারি নীতিসমূহও প্রভাবিত করতে পারে এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত তথ্য, মানদণ্ড এবং চর্চা প্রচারের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। এসব গ্রুপ স্থানীয় জ্ঞান তুলে আনতে পারে, নীতি-নির্ধারকদের কাছে সহজে পৌঁছাতে পারে, ইস্যুসমূহ তুলে ধরতে পারে, এবং সম্মিলিতভাবে মানবাধিকার উন্নয়নে কাজ করতে পারে।

সিএইচআরআই ভারতের নয়াদিল্লীভিত্তিক একটি সংস্থা। যুক্তরাজ্যের লন্ডন এবং ঘানার আক্রায় এর কার্যালয় আছে।

আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিশন: সভাপতি - স্যাম ওকুদজেটো এবং সদস্যবৃন্দ - এ্যালিসান ডাক্সবুরি, যশপাল ঘাই, নেভিল লিনটন, বি. জি. ভারঘিজ, জোহরা ইউসূফ ও মাজা দারুওয়ালা

নির্বাহী কমিটি (ভারত): সভাপতি - বি. জি. ভারঘিজ এবং সদস্যবৃন্দ - বি. কে চন্দ্রশেখর, ভগবান দাস, নিতিন দেশাই, ওয়াজাত হাবিবুল্লাহ, হরিবংশ, সঞ্জয় হাজারিকা, কমল কুমার, পুনম মুটরেজা, রুমা পাল, এ. পি. সাহ এবং পরিচালক - মাজা দারুওয়ালা

নির্বাহী কমিটি (ঘানা): সভাপতি - স্যাম ওকুদজেটো এবং সদস্যবৃন্দ - আনা বসমান, নেভিল লিনটন, এমিল সর্ট, বি. জি. ভারঘিজ এবং পরিচালক - মাজা দারুওয়ালা

নির্বাহী কমিটি (যুক্তরাজ্য): সভাপতি - নেভিল লিনটন এবং সদস্যবৃন্দ - ফ্রান্সেস ডি সুজা, মীনাক্ষী ধর, ডেরেক ইনগ্রাম, ক্লেয়ার মার্টিন, সৈয়দ শরফুদ্দিন, জো সিলভা ও স্যালি -অ্যান উইলসন।

কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ লয়্যারস অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ লিগ্যাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথ ব্রডকাস্টিং অ্যাসোসিয়েশন

মূল তথ্যসূত্রের স্বীকৃতি প্রদান সাপেক্ষে এ নির্দেশিকার তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিএইচআরআই প্রধান কার্যালয়, নয়াদিল্লী
বি- ১১৭, দ্বিতীয় তলা
সর্বদয়া এনক্লেভ
নয়াদিল্লী-১১০ ০১৭
ভারত
টেলিফোন: +৯১ (০)১১ ৪৩১৮ ০২০০
ফ্যাক্স: +৯১ (০)১১ ২৬৮৬ ৪৬৮৮
ই-মেইল: info@humanrightsinitiative.org

সিএইচআরআই যুক্তরাজ্য, লন্ডন
ইনস্টিটিউট অব কমনওয়েলথ স্টাডিজ
স্কুল অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন
৩য় তলা, দক্ষিণ ব্লক, সিনেট হাউজ, ম্যালেট স্ট্রিট
লন্ডন ডব্লিউ সি ১ই ৭এইচইউ, যুক্তরাজ্য
টেলিফোন: +৪৪(০) ২০৭ ৮৬২ ৮৮৫৭
ফ্যাক্স: +৪৪(০) ২০৭ ৮৬২ ৮৮২০
ই-মেইল: chri@sas.ac.uk

সিএইচআরআই আফ্রিকা, আক্রা
বাড়ি নং ৯, সামোরা ম্যাশেল স্ট্রিট
এসাইলাম ডাউন
(বেভারলী হিলস্ হোটেলের বিপরীতে এবং ট্রাস্ট টাওয়ার্স এর নিকটে), আক্রা, ঘানা
টেলিফোন: +২৩৩ ৩০২৯৭১১৭০
টেলিফোন/ফ্যাক্স: +২৩৩ ৩০২৯৭১১৭০
ই-মেইল: chriafr@africaonline.com.gh

www.humanrightsinitiative.org

নির্দেশিকা সম্পর্কে কিছু কথা

১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ তথ্য স্বাধীনতাকে একটি মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে একে ''জাতিসংঘ যে স্বাধীনতাগুলোর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ তার পরশ পাথর'' হিসেবে স্বীকার করেছে। এর পর পরই নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের ওপর প্রণীত আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৯ নং অনুচ্ছেদে 'তথ্য অধিকার' এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একে আন্তর্জাতিকভাবে আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তখন থেকে ৯০টিরও বেশি দেশ অভ্যন্তরীণ আইনে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় আইন পাশ করে।

তথ্য প্রাপ্তি আইন যখন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তখন শুধুমাত্র এটি পাশ করাই যথেষ্ট নয়। এ আইনটি নিজেই দেশে একটি বদ্ধ শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশে রূপান্তর ঘটাবে। তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষায় আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতি, আইনের ধারাবাহিকতাহীনতা, প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা; এবং কর্মকর্তাদের আইনটি সম্পর্কে ধারণার অভাব- তথ্যের গোপনীয়তা সংস্কৃতি থেকে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দূর করা দরকার।

সিএইচআরআই-এর 'তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন: প্রায়োগিক নির্দেশিকা' নিম্নলিখিত উপায় নির্দেশনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে:

ক) একটি সহায়ক আইনগত পরিবেশের সূচনা;
খ) শক্তিশালী ও কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন; এবং
গ) যথাযথ পরিবীক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

যখনই তথ্য স্বাধীনতা আইনসমূহ সঠিক ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় শুধুমাত্র তখনই এ আইন শাসন প্রক্রিয়ার যথাযথভাবে পরিচালন, আমলাতান্ত্রিক দক্ষতার উন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাস, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বৈদেশিক বিনিয়োগে সহায়তা দান, এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহ সফল করতে সাহায্য করতে পারে এবং সেইসাথে এ আইনসমূহ একটি বদ্ধ শাসন ব্যবস্থাকে মুক্ত ও গতিশীল গণতন্ত্রে পরিণত করার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে।

ফ্রেডরিক-নওমান-স্টিফটাং ফার ডাই ফ্রেইহিট

ফ্রেডরিক-নওমান-স্টিফটাং ফার ডাই ফ্রেইহিট হচ্ছে উদার রাজনীতি চর্চার একটি ফাউন্ডেশন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৫৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রথম জার্মান ফেডারেল রাষ্ট্রপতি থিওডর হুস ছিলেন এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বাধীনতার ধারণা এবং প্রতিষ্ঠার কৌশল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বর্তমানে এই ফাউন্ডেশন বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে কাজ করে যাচ্ছে। এই ফাউন্ডেশনের মূল কর্ম উপাদান হচ্ছে নাগরিক শিক্ষা, রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দান এবং রাজনৈতিক সংলাপ আয়োজন।

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, বাজার অর্থনীতি এবং আইনের শাসন সমন্বিত ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে ফ্রেডরিক-নওমান-স্টিফটাং ফার ডাই ফ্রেইহিট ফাউন্ডেশন সাহায্য করে থাকে। বিশ্বে উদার রাজনীতি চর্চার একমাত্র সংগঠন হিসেবে এই ফাউন্ডেশন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনে কাজ করে যাচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে স্বাধীনতার জন্য প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং সহনশীলতার বলিষ্ঠ ঐতিহ্য রয়েছে। সেইসাথে আছে বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ক্রমান্বয়ে নিজেদের উপস্থিতি জোরদার করছে এবং অর্থনীতির আরো উদারীকরণ হচ্ছে। এরকম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ফাউন্ডেশনটি সহযোগী সংগঠনগুলোর সাথে গণতন্ত্রের কাঠামো শক্তিশালীকরণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পূর্বশর্তসমূহ এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

ISBN: 978-984-33-1562-5

সহযোগিতায়:

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাড়ি ১৪১, রোড ১২, ব্লক ই, বনানী,
ঢাকা – ১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬,
ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ
সিএইচআরআই প্রধান কার্যালয়
নয়াদিল্লী বি- ১১৭, তৃতীয় তলা সর্বদয়া এনক্লেভ
নয়াদিল্লী-১১০ ০১৭, ভারত
টেলিফোন: +৯১-১১-২৬৮৫-০৫২৩, ২৬৮৬-৪৬৭৮
ফ্যাক্স: +৯১-১১-২৬৮৬-৪৬৮৮
ই-মেইল: info@humanrightsinitiative.org
ওয়েবসাইট: www.humanrightsinitiative.org

Friedrich Naumann STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

ইউএসও হাউজ
৬, স্পেশাল ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া
নয়াদিল্লী ১১০০৬৭, ভারত
ফোন: +৯১-১১-২৬৮৬ ২০৬৪/২৬৮৬ ৩৮৪৬
ফ্যাক্স: +৯১-১১-২৬৮৬ ২০৪২
ওয়েবসাইট: www.southasia.fnst.org
www.stiftung-freiheit.org